Vol. 49 | No. 2 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শহীদুল জহিরের ছোটগল্পে পুরনো ঢাকার চালচিত্র

Volume	49
Issue	2
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Tashrik-E-Habib
Published online	March 1, 2025
DOI	10.62328/sp.v49i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i2.6
Pages	৮৯-১৩০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

শহীদুল জহিরের ছোটগল্পে পুরনো ঢাকার চালচিত্র

তাশরিক-ই-হাবিব*

Check for updates

শহীদুল জহির[১] পুরনো ঢাকার পরিসরে[২] মানুষের বিশিষ্ট জীবনচর্যা, সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ, বিশ্বাস-সংস্কার ও প্রবহমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে তাদের প্রাত্যহিকতার চালচিত্রকে ছোটগল্পে যেভাবে বিনির্মাণ করেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তা নিঃসন্দেহে বিরল, অভাবনীয়। শৈশবের কয়েকটি বছর এতদঞ্চলে অতিবাহিত করার অভিজ্ঞতাই[৩] সম্ভবত তাঁকে চার শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী পুরনো ঢাকার বিশিষ্ট আবহনির্ভর[৪] কথাসাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। শামসুর রাহমানের কবিতা ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যেও উক্ত জনপদের সামূহিক অভিব্যক্তি স্বকীয় মাত্রায় উত্তীর্ণ। শহীদুল জহির আদি ঢাকাবাসীর[৫] সার্বিক জীবনচিত্রের শিল্পিত ভাষ্য রচনায় সচেতনভাবেই পূর্বসূরিদের থেকে ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন গল্পে ঘুপচি গলি, পাড়া-মহল্লার রাস্তাঘাট ও ল্যাম্পপোস্ট, ম্যানহোল, ফুটপাত থেকে শুরু করে মসজিদ, মন্দিরপ্রাঙ্গণ, দোকান, হোটেল, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্প-কারখানা, প্রেক্ষাগৃহ প্রভৃতির সমবায়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অবিরাম কলতান, আড্ডা, ঠাট্টা-পরিহাস ও ব্যঙ্গাত্মক মনোভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।[৬] জাতীয় জীবনের অসংখ্য বাঁক-পরিবর্তনশীল মুহূর্তের পাশাপাশি রাজনৈতিক অভিঘাতের নেতিবাচকতায় এতদঞ্চলের সমাজদেহের সার্বিক বিকৃতির নিঁখুত বাচন হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটগল্পসমূহ। তবে এর সমান্তরালে জীবনের অর্থবহ উদ্ভাসনের প্রচেষ্টায় মানুষের আন্তর্গরজ ও শুভচেতনার উন্মীলনও শহীদুল জহিরের শিল্পিসত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

'ডুমুরখেকো মানুষ' যাদুবাস্তবতার প্রকরণে শহীদুল জহিরের অসামান্য শিল্পসাফল্যের গৌরবে সমুজ্জ্বল একমাত্র ছোটগল্প। এর প্রারম্ভ থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত সর্বত্রই পরাবাস্তব আবহ, বিভ্রম, যাদু, স্বপ্ন, কল্পনা ও চেতন-অবচেতনের বিচিত্র মিথস্ক্রিয়ায় সমষ্টিমানুষের মনোজগতে অবদমিত প্রবৃত্তিসমূহের উন্মোচনে লেখক সচেষ্ট। পুরনো ঢাকার বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে জাদু বা ইন্দ্রজালের খেলা 'ভেলকি' নামে সুপরিচিত। গল্পের প্রারম্ভেই ভিক্টোরিয়া পার্কে সমবেত জনতার সম্মুখে আবির্ভাব ঘটে মোহাব্বত আলি যাদুকরের, যার মুখের হাসি পেশাগত কারণেই রহস্যময়। কেননা এর মাধ্যমে দর্শকের অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণে সে উৎসাহী। এছাড়াও যাদুর খেলা দেখানোর প্রয়োজনেই তার পোশাক-পরিচ্ছদ গড়পরতা মানুষের চেয়ে ভিন্ন। লেখকের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় পাঠকের মনোগহীনে সে যে প্রতিচিত্রে উপস্থিত, সেই বিবরণটিও গল্পে সঞ্চার করে বিশেষ আবহ। মোহাব্বত আলির পাতলুনের ডান পায়ের প্রান্ত সাইকেলের ক্লিপে আবদ্ধ, পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতো, সাদা ফুল হাতা শার্টের প্রান্ত ধূসর রঙের প্যান্টের ভেতর আবৃত, মাথার চকচকে টাক একটি জীর্ণ-কুঞ্চিত কাপড়ের হ্যাটে

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আচ্ছাদিত। নাটকীয় ভঙ্গিতে দর্শকদের সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় বাম হাত পকেটে ঢুকিয়ে ডান হাতে মানবদেহের একটি শুকনো ও ধূসর রঙের গলার হাড় উত্তোলন করে দর্শকদের বিভ্রান্ত করতে সে সচেষ্ট। তাই সেটি প্রদর্শনপূর্বক প্রশ্নোত্থাপনের পরবর্তী মুহূর্তে তাদের উত্তরের প্রত্যাশায় কিছুক্ষণ নীরব কালক্ষেপণের একপর্যায়ে সে নিজেই এর উত্তর প্রদান করে। মূলত এগুলো হলো তার বহু যত্নে আত্তীকৃত ক্রীড়ার কলাকৌশলাদি, যার সম্মিলনে ধাপে ধাপে সে অগ্রসর হয় দর্শককে বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় ফেলে ব্যবসায়িক স্বার্থোদ্ধারে। অতঃপর সে নিজেই নিজের নিক্ষিপ্ত প্রশ্নের প্রদত্ত উত্তরকে অস্বীকার করে, 'এইটা কুনো হাড্ডি না, এইটা একজন মায়ালোক, একজন মহিলা, ওর নাম প্রীতিলতা, ... আমার প্রেমিকা, আমার ইস্ত্রী, আপনেরা যদি ধৈর্য ধইরা খাড়ান তাইলে ব্যাকতের শেষে এই প্রীতিলতারে আপনেরা দেখতে পাইবেন; সে খুব সুন্দরী মায়ালোক' (জহির, ২০০৬ : ৮৪)। জনতার হাসি থামিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক এগারো জন পুরুষের নাম শোনার পরবর্তী মুহূর্তেই সে নামগুলো নির্ভুলভাবে দর্শকদের জানায়। এরপর শুরু হয় তার ভেলকিবাজির বিচিত্র প্রদর্শনী। পূর্বেই জনসমক্ষে উপস্থাপিত হাড়টিকে একটি চাদরে ঢেকে সে ঘোষণা করে — প্রীতিলতা ঘুম থেকে উঠে তাদের সালাম জানাবে। অতঃপর আরেকটি হাড় দর্শকদের দেখিয়ে সে সেটিকে 'আবদুল' নামে সম্বোধন করে। পরবর্তী পর্যায়ে সেটি দিয়ে বাতাসে দুবার বৃত্ত কেটে চোখ বন্ধ অবস্থায় বিড়বিড় করে কিছু বলে যখন সে ডানপাশের বালকের নাক টিপে দেয়, 'সঙ্গে সঙ্গে তার করতলের ভেতর রূপালি ইলিশের মতো নেচে ওঠে একটি আধুলি' (জহির, ২০০৬ : ৮৫)। তার এ কাণ্ডে বিনোদিত দর্শকরা মিটিমিটি হাসিতে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় 'সে বৃত্তের চারদিকে ঘুরে ঘুরে বালকদের নাক টিপে ক্রমাগত আধুলি বের করতে থাকে' (জহির, ২০০৬ : ৮০)। অতঃপর তার ক্রীড়ার পাত্র নির্বাচিত হয় বয়স্ক ব্যক্তিরা। একপর্যায়ে সে বৃত্তাবদ্ধ দর্শকের সারিতে দণ্ডায়মান একজন স্থূলকায় ব্যক্তির পেটে দুবার হাত বুলিয়ে চাপ প্রয়োগের ফলে 'পুরনো দিনের বাসের হর্নের শব্দের মতো একটি হাস্যকর শব্দ সকলে শুনতে' (জহির, ২০০৬ : ৮৫) পায়। 'তখন মোহাব্বত আলি ঘন ঘন ভুঁড়ি টিপে দিতে থাকলে ওয়াও ওয়াও করে একটি শব্দ ক্রমাগতভাবে নির্গত হতে থাকে এবং ভিক্টোরিয়া পার্কে উপস্থিত দর্শকরা হাসিতে অস্থির হয়ে পড়ে' (জহির, ২০০৬ : ৮৬)। নিজের গ্রহণযোগ্যতা দর্শকদের নিকট যাচাইয়ের মাধ্যমে কৌশলী মোহাব্বত আলি তাদের নিকট নিজের প্রকৃত বৃত্তান্ত উপস্থাপন করে। ডুমুর ফল বিক্রেতা হিসেবেই সে এতক্ষণ বিনামূল্যে দর্শকদের মনোরঞ্জনে তৎপর ছিল, যা স্পষ্ট হয় তার পরবর্তী ঘোষণায়। অতঃপর সে তাদের জানায় উক্ত ফল উৎপাদন সম্পর্কিত এক অতিলৌকিক বৃত্তান্ত। ফরাশগঞ্জের বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে স্বীয় প্রাসাদের পেছনে যোজন বিস্তৃত বাগিচায় সে প্রীতিলতা ও আবদুলের সহায়তায় গড়ে তুলেছে ডুমুরের বাগান, যেখানে 'শুধু ডুমুরের গাছ, হলুদ রঙের গোল গোল ডুমুরের গুচ্ছ ঝুলে থাকে;' (জহির, ২০০৬ : ৮৬) এবং তারা তিনজন শুধু ডুমুর খেয়েই জীবনধারণ করে। অতঃপর উক্ত ফল বিক্রির জন্য তার নতুন ভেলকিবাজি উপস্থাপনে চমক সৃষ্টির ফলে ডুমুরের প্রতি সমবেত দর্শকের তীব্র কৌতূহল পরিলক্ষিত হয়। একটি টিনের কালো রঙের তালাবদ্ধ বাক্সের ওপর আবদুল নামক হাড়কে চক্রাকারে সঞ্চালন ও পূর্ববৎ বিড়বিড় করে মন্ত্র পাঠের পরবর্তী পর্যায়ে সে যখন বাক্সটির ডালা উন্মোচন করে, তখন সেখানে পল্লবাবৃত হলুদ ডুমুরের আবির্ভাব ঘটে। পঁচিশজন

দর্শককে বিনামূল্যে একটি করে ডুমুর প্রদানকালে সে স্পষ্টই জানিয়ে দেয়, বয়স্ক এগারো জন ব্যক্তির প্রত্যেককে সে আধডজন করে ডুমুর বিক্রিতে সম্মত, যার মূল্য দুই টাকা। একবার সে যাদের নিকট ডুমুর বিক্রি করে, আজীবন তাদের নাম তার স্মরণে থাকে। পরবর্তীকালে কেউ ডুমুর কিনতে চাইলে তাকে পরিশোধ করতে হবে চার টাকা। এভাবেই প্রতিবার ফলগুলোর মূল্য পূর্ববর্তীবারের দ্বিগুণ হিসেবে নির্ধারণের পাশাপাশি ডুমুরগুলো একবারে ভক্ষণ না করতে সে তার ক্রেতাদের সতর্ক করে। এ পর্যায়ে জনতা ভেলকিবাজি দর্শনের চমকে ইতোমধ্যেই প্রীতিলতার কথা বিস্মৃত হয়ে যাদুকরের নিত্য নতুন কাণ্ডে হতবাক। ঠিক সেই মুহূর্তে আকস্মিকভাবে তার চিৎকারে চাদরে আবৃত হাড়ের আড়াল থেকে 'ভিক্টোরিয়া পার্কের ধুলোমলিন ঘাসের ওপর প্রকাশিত হয় ভরাপূর্ণিমার মতো ঝলোমলো এক যুবতী নারী' (জহির, ২০০৬ : ৮৪)। এভাবেই সেই এগারোজন পুরুষ দিবাভাগেই এক পরাবাস্তব জগতের বাসিন্দা হয়ে ওঠে এবং তাদের বিভ্রান্তিকে পরিপূর্ণতা দিতেই সেই উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণীকে সাইকেলে উপবেশনপূর্বক মোহাব্বত আলির প্রস্থান ঘটে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে তার ক্রীড়ার আসরে পুনরাবির্ভাব ঘটে দুই পুরনো ক্রেতার, যারা এবার দ্বিগুণ অর্থে ডুমুর ক্রয়ে বাধ্য হয়। ছয় মাসের ব্যবধানে পাঁচজন পুরনো ক্রেতার ক্রয়কৃত ডুমুরের মূল্য নির্ধারিত হয় চৌষট্টি টাকা। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তারা পরবর্তী পর্যায়ে ডুমুর গাছ ক্রয়ে হাজার টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত জাদুকরকে জানায়, যদিও এ অভিলাষের বাস্তবায়ন তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। এ ঘটনা থেকেই প্রতীয়মান হয়, ডুমুরের মতো ফলের জন্য তাদের এ ব্যগ্রতার অন্তরালে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে মোহাব্বত আলির ভেলকিবাজির চমক ও ডুমুর সম্পর্কিত অলীক গালগল্প। অতঃপর একদিন সকালে প্রবল উন্মাদনার ঘোরে তারা উপস্থিত হয় রূপকথার প্রতিতুল্য বিভ্রান্তির জগতে অধিষ্ঠিত যাদুকরের মায়াবী প্রাসাদে; যেটি যাদুর কুহকে, রহস্যের ছদ্মাবরণে তাদের সম্মোহিত করে অমৃততুল্য ডুমুর প্রাপ্তির আশায় —

> তারা শ্যামবাজার পার হয়ে দক্ষিণ দিকে তাকাতেই এক সুউচ্চ প্রাসাদ দেখতে পায়; তারা দেখে যে, একেবারে নদীর ধারে, মনে হয় যেন নদীর ওপরেই, সোনালি রঙের গম্বুজওয়ালা এক অতিকায় অট্টালিকা আকাশের ভেতর উঠে গেছে। তারা পাঁচজন ডুমুরখেকো যখন প্রাসাদের সিংহদরজা অতিক্রম করে, তারা এই দরজা, সামনের প্রাঙ্গণ এবং প্রাসাদের সিঁড়ি ও বারান্দা অরক্ষিত দেখতে পায়, তারা কোনো ডুমুর বাগান দেখে না, তবে তারা বুঝতে পারে যে, যোজনবিস্তৃত এই বাগান প্রাসাদের পিছনে হবে, কিন্তু পাশ দিয়ে প্রাসাদের পিছনে যাওয়ার কোনো পথ তারা দেখতে পায় না। (জহির, ২০০৬ : ৯০)

যাদুকরের প্রাসাদে উপস্থিত হয়েও ডুমুরের বাগান অনুসন্ধানে ব্যর্থতার পরিণতিতে চিৎকার করে মোহাব্বত আলিকে আহবানের ঘটনায় উন্মোচিত হয় তাদের মনোজাগতিক উদ্বেগ ও অস্থিরতা, সর্বোপরি অনির্দেশ্য ভীতিবোধের। পর্দাবৃত দরজা খুলে অবশেষে তারা যাদুকরের সাক্ষাৎ পেলেও সে পাঁচ অভিযাত্রীকে চরম অসন্তোষজনক কণ্ঠে উক্ত স্থান দ্রুত পরিত্যাগের নির্দেশ দেয়। তার রূঢ় আচরণে ভয়ের তাড়নায় মরীয়া হয়ে প্রাসাদ পরিত্যাগকালে পাঁচ অভিযাত্রী আকস্মিকভাবে মোহাব্বত আলির ভেলকিবাজির আনুষঙ্গিক উপকরণ ও বিভিন্ন অস্ত্রের সন্ধান পায়। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তাদের অবচেতনে

নিমেষেই ঘটে যায় ভাবান্তর। তাই ক্ষণকাল পূর্বেই প্রাণ বাঁচাতে ব্যতিব্যস্ত পাঁচ ব্যক্তি নিজেদের অজান্তেই হঠাৎ রূপান্তরিত হয় ঘাতকে। এক্ষেত্রে যাদুকরের ব্যবহৃত অস্ত্রসমূহই হয়ে ওঠে তাদের পরম সহায়। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে তাদের সশস্ত্র তাণ্ডবে তার ভবলীলা সাঙ্গ হলে প্রাসাদের অভ্যন্তরে ডুমুরের বাগানের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা প্রত্যাবর্তন করে পরাবাস্তবের জগৎ থেকে মর্ত্যলোকে। অতঃপর তারা আবিষ্কারে সমর্থ হয় তার কথিত মায়াবী প্রাসাদের অন্তর্রহস্য —

> যখন ইমারত ত্যাগ করে সিংদরজার নিকট চলে আসে তখন মনে হয় যেন তারা সম্বিৎ ফিরে পায় এবং তখন তারা পিছনে ফিরে কোনো সোনালি গম্বুজওয়ালা অট্টালিকার চিহ্ন দেখতে পায় না, কোনো মাঠ কিংবা সিংদরজাও দেখে না, তারা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে পানির কিনারায় এক কাঠ চেরাইয়ের কারখানার পাশে নিজেদের আবিষ্কার করে; তারা প্রথমে ভাবে যে, এতক্ষণ যা কিছু ঘটেছে তা স্বপ্ন ছিল, কিন্তু তখন তারা নিজেদের হাতে লোহার রড ও খঞ্জর এবং নিজেদের গায়ের জামা রক্ত রঞ্জিত দেখতে পায়। (জহির, ২০০৬ : ৯২)

বিভ্রমের ঘোর কেটে যেতেই তারা নিজেদের আততায়ী হিসেবে আবিষ্কারের পরবর্তী পর্যায়ে আক্রান্ত হয় চরম আতঙ্ক ও অবসাদে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বীয় বাড়িসমূহে প্রত্যাবর্তনের একপর্যায়ে জ্বরের প্রাবল্যে তারা মৃত্যুবরণ করে; স্মৃতি হিসেবে বিছানায় পড়ে থাকে প্রত্যেকের একটি করে ধূসর বর্ণের অস্থিখণ্ড। এভাবেই তারা হয়ে ওঠে পুরনো ঢাকার বিভিন্ন মহল্লার অধিবাসীদের নিকট কিংবদন্তির কুশীলব। এ গল্পে লেখক যাদুবাস্তবতার সমাহার ঘটাতে সচেতনভাবেই মোহাব্বত আলি যাদুকরের দ্বারস্থ হয়েছেন। কারণ ডুমুরের মতো সামান্য ফল বিক্রির মোক্ষম কৌশল হিসেবে তার প্রযুক্ত বিভিন্ন ভেলকিবাজির অমোঘ কার্যকারিতা গল্পের পরিসমাপ্তি অংশে নির্দেশিত। এমনকি শুধু মুখের কথাকে বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে ব্যবহারের মাধ্যমেই যে শ্রোতার মনোজগতে নির্মাণ করা যায় এক অলীক ভুবন, তার নিপুণ দৃষ্টান্তও সে রেখেছে। মোহাব্বত আলির বর্ণিত প্রাসাদের বিবরণ ও ডুমুরের পরাবাস্তব আখ্যান পাঁচজন বয়স্ক ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়, যদিও এর বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কিত অসচেতনতাবশতই তার অপমৃত্যু ঘটে। আবদুল গফুর, আবদুল জলিল, শরফুল আলম, শহীদুল হক ও ইদ্রিস আলি প্রমুখ ডুমুরের মতো অতি পরিচিত ও সস্তা ফল যা কিনা এদেশের বনে-জঙ্গলে হরহামেশাই পাওয়া যায়, তার জন্য হাজার টাকা খরচ করতেও সম্মতি জ্ঞাপন করেছিল। এর নেপথ্যেও রয়েছে মোহাব্বত আলি যাদুকরের ভেলকিবাজি ও ডুমুরের রহস্যাতীত বৃত্তান্ত উপস্থাপনের অসামান্য পারদর্শিতা, যার মূল ভিত্তি যাদুবাস্তবতা। তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তিমানসে সংগুপ্ত আদিম রিপু ও প্রবৃত্তিসমূহের ভয়াবহ রূপ উন্মোচনের তাগিদেই মূলত, লেখক এ গল্পে এত সূক্ষ্মভাবে যাদুবাস্তব ঘটনা-সংবলিত নিখুঁত বিবরণকে সন্নিবিষ্ট করেছেন। তাই গল্পের পরিশিষ্ট অংশে পাঁচ হত্যাকারীর শয্যায় এক টুকরো হাড়ের উপস্থিতি গল্পের প্রারম্ভে প্রীতিলতা ও আবদুল সম্পর্কিত যাদুকরের বয়ানের প্রতি পাঠককে পুনরায় ধাবিত করে। অপরাধবোধে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক দণ্ড প্রদানের নিমিত্তে লেখক তাদের জন্য অন্য কোনো দণ্ডের বন্দোবস্ত নির্দেশ করতে পারতেন। তবু তিনি গতানুগতিকতার পথ পরিহারপূর্বক যাদুবাস্তবতা প্রযুক্ত করার মাধ্যমে তাদের অন্তিম পরিণতি নির্দেশ করেছেন। এর অন্তরালে সম্ভবত সভ্য

সমাজে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি প্রদানের প্রচলিত বিধির পরিবর্তে তাদের নৈতিক অস্তিত্বহীনতার বিষয়টি তাঁর চিন্তনে অধিক গুরুত্ব হিসেবে বিবেচিত।

'এই সময়'[৭] গল্পে পুরনো ঢাকার নর-নারীর প্রণয়ভাবনার[৮] সমান্তরালে অবক্ষয়িত সমাজের কলুষিত রূপ প্রকট হয়েছে বাহুবল ও অস্ত্রের দাপটে মহল্লার মাস্তানদের বিত্তবান কর্তৃক স্বার্থোদ্ধারে ব্যবহারের ঘটনায়। এছাড়াও তাদের যথেচ্ছ কর্মকাণ্ডের বিপরীতে প্রশাসনের নীরব ভূমিকা পালনের ছলে পরোক্ষভাবে দুর্নীতি ও অপরাধকে মদদ দানের ঘটনায় লেখক এতদঞ্চলের জনজীবনের ব্যাধিগ্রস্ত রূপকেও উন্মোচন করেছেন। এ গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ষোলো বছরের তরুণের সঙ্গে আট বছরের সংসারাভিজ্ঞা বাইশ বছরের অনিন্দ্যসুন্দরী বিধবা যুবতীর প্রণয়ের ভিন্নধর্মী অথচ বাস্তবোচিত অনুষঙ্গসমূহ। তবে লেখক নর-নারীর প্রেমাবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণকে কোনো নৈতিক মানদণ্ডের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে যে অনাগ্রহী, তা প্রতীয়মান হয় মোহাম্মদ সেলিম ও শিরীন আকতারের প্রণয়াবেগের অকৃত্রিম আত্মপ্রকাশের ঘটনায়। এক্ষেত্রে তাদের ট্র্যাজিক পরিণতি নির্দেশের ক্ষেত্রেও তিনি পারিপার্শ্বিক সমাজ ও জনজীবনের অভিজ্ঞতার শিল্পভাষ্য নির্মাণে আন্তরিক। মোহাম্মদ সেলিমের নাতিদীর্ঘ জীবনাখ্যানের প্রারম্ভে রয়েছে তার জন্মের দুই দিনের ব্যবধানে পিতা-মাতাকে হারিয়ে এতিম হওয়ার মর্মস্পর্শী বাস্তবতা। এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে ভূতের গলির তিন মাস্তান ভাইয়ের দ্বারা তার নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে মহল্লার বাসিন্দাদের চেতনালোকে তাৎপর্যবহ অধিষ্ঠানের মাধ্যমে। মানবশিশুর জন্ম ও মৃত্যুর যে স্বাভাবিক পরিণতি জনঅভিজ্ঞতায় সঞ্চারিত হয়, সেই বিবেচনায় তার জীবনবৃত্তান্ত মহল্লাবাসীর নিকট ব্যতিক্রমী হিসেবেই পরিগণিত। কারণ, নয় মাসের গর্ভস্থ শিশুর (সেলিম) ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষণকাল পূর্বেই সড়ক দুর্ঘটনায় তার পিতা বাবুল মিয়ার মৃত্যু ঘটে। অতঃপর বারো ঘন্টার ব্যবধানে আলো-হাওয়ার পৃথিবীতে সেলিমের পদার্পণের দুই দিনের মধ্যেই তার মায়ের মৃত্যুর করুণ ঘটনা মহল্লাবাসীকে ব্যথিত করে। যথারীতি এতিম শিশুটির দায়িত্ব স্থানান্তরিত হয় তার একমাত্র স্বজন বৃদ্ধা দাদির ওপর। তার নিকট প্রতিপালিত সেলিমের কিশোর চিত্তে অদেখা জনক-জননীর প্রতি হৃদয়ের পরম ভালোবাসা জাগ্রত হওয়ায় আজিমপুরে তাদের কবরস্থানে ফুল দেয়ার জন্য সে যে বাগান গড়ে তোলে,[৯] সেটি পরবর্তী পর্যায়ে মহল্লায় সৃষ্টি করে নতুন সংকট। ফুলের আকর্ষণে মৌমাছি ও ভ্রমরের আবির্ভাব ঘটলে মহল্লাবাসীকে তা দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়। এ ঘটনা পরবর্তী পর্যায়ে অর্জন করে নতুন মাত্রা, যখন 'মহল্লায় বৃষ্টি নামে এবং বৃষ্টির পর লোকদের ক্রমাগত হাঁচি হতে থাকে এবং চোখ দিয়ে পানি গড়ায়' (জহির, ২০০৬ : ৯৫)। এর সংক্রমণে অসুস্থ হয় সুতাকল ও সাততলা দালানের মালিক এরশাদ সাহেব, শরীয়ত পার্টির অনুসারী মওলানা আব্দুল জব্বার, হোটেল ও ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের স্বত্বাধিকারী মালেকা বানু ও মেজর (অবঃ) ইলিয়াছ খান প্রমুখ; যারা মহল্লার তিন সন্ত্রাসী ভাই আবু, হাবু ও শফিকে অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন অপকর্মে ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। তবে তাদের পক্ষেও এর প্রতিকার অসম্ভব হয় এবং একপর্যায়ে তারাও আক্রান্ত হয় উক্ত সমস্যায়। মাসাধিককালের ব্যবধানে এ ঘটনার অন্তর্রহস্য উদ্ঘাটিত হলে তিন ভাইয়ের অপতৎপরতায় বিধ্বস্ত সেলিমের ফুলবাগান পুনরায় গড়ে ওঠে তার আন্তরিক প্রযত্নে।

অতঃপর ভূতের গলিতে পুনরায় প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত হয় আব্দুল আজিজের রূপবতী কন্যা শিরীন আকতারের স্বামী হারিয়ে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের ঘটনায়। ক্রমশই সে হয়ে ওঠে মহল্লাবাসীর আলোচনার মধ্যমণি। তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই 'করাতকলের মালিক আজিজ মিয়ার বাড়িতে মানুষের আনাগোনা বেড়ে যায়' (জহির, ২০০৬ : ৯৮)। বিপত্নীক বৃদ্ধ এরশাদ সাহেবের অকারণে তার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়াস, জব্বার মওলানার *বেহেশতি জেওর* ও আবুর দুটি লাল গোলাপ উপহার দানের ঘটনায় শিরীন সহজেই অনুধাবনে সক্ষম হয় তার প্রতি উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের আগ্রহের স্বরূপ। এক পর্যায়ে আবুর সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে যখন সে অবহিত হয়, উক্ত গোলাপদ্বয় মহল্লারই বাসিন্দা সেলিমের বাগানের, তখন "শিরীন আকতার তার মুখে আবছা হাসি ধরে রেখে বলে, 'তাইলে তারে কইয়েন আমারে প্রত্যেক দিন ফুল দিবার লাইগা" (জহির, ২০০৬ : ১০০)। এভাবেই তার স্মৃতিপটে জীবন্ত হয়ে ওঠে সেলিমের অতীত বৃত্তান্ত। প্রতিদিন নিজের বাগানের প্রস্ফুটিত ফুল শিরীনকে পৌঁছে দেয়ার আদেশপ্রাপ্ত হয়ে তরুণ সেলিম 'তাদের পাঁচিলের ওপর দিয়ে দূরে আজিজ মিয়ার ছত্রিশ নম্বর বাড়ির ছাদের দিকে তাকায় এবং দেখে যে, শূন্য ছাদের কার্নিশের পিছনে কলাবতী ফুলের মতো সন্ধ্যার মেঘ ফুটে আছে' (জহির, ২০০৬ : ১০০)। এটি প্রকৃতপক্ষে তার নিস্তরঙ্গ চিত্তলোকে সেই সৌন্দর্যময়ী নারীর (কলাবতী ফুলের উপমান) প্রতি প্রেমাবেগের উন্মেষকালীন মুহূর্ত, যা সন্ধ্যার মেঘ অর্থাৎ ক্ষণস্থায়িত্বের ইঙ্গিতবহ। কেননা গোধূলির আলো ফুরিয়ে যেতেই সন্ধ্যার মেঘ ঢেকে যায় নিকষ কালো অন্ধকারের আচ্ছাদনে। অতঃপর শিরিনকে সেলিমের বাগানের বিভিন্ন ফুল প্রতিদিন উপহার দেয়ার মাধ্যমে নিজেদের অজান্তেই তারা পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হয়। সেকারণেই দিনের পর দিন বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের সময় অতিবাহিত হয় কখনো মেঘের বিচিত্র অবয়বের স্বরূপ উদ্ঘাটনে, কখনো বিভিন্ন ফুল ও গাছের পাতা সংক্রান্ত আলাপ, খুনসুটি ও রাতে চাঁদের আলোয় পরস্পরের ছায়াচিত্র নির্মাণে। এরশাদ সাহেবের প্রদত্ত গহনা, জব্বার মওলানার উপঢৌকনস্বরূপ প্রাপ্ত জামদানি শাড়ি, মাস্তান ভ্রাতৃত্রয়ের উপহৃত মেশক-এ-আম্বর আতরের পরিবর্তে শিরীনের নিকট সেলিম প্রদত্ত বিভিন্ন ফুল ও পাতা যে মহার্ঘ্য বিবেচিত, অচিরেই মহল্লাবাসী তার প্রমাণ পায়। তার প্রতি আসক্ত মাস্তান আবু মেজর ইলিয়াছকে সতর্ক করলে 'মেজর ইলিয়াছ তখন হাসে এবং বলে, ঠিক আছে, অল্প একটু শেয়ার দেও! / অরে আমি বিয়া করমু' (জহির, ২০০৬ : ১০৩)। উপর্যুক্ত বাক্যালাপে প্রকাশিত হয় নারীর প্রতি আধিপত্যকামী পুরুষের কদর্য দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি। ব্যক্তিত্বময়ী ও আত্মসচেতন শিরীন বিভিন্ন উপহার প্রাপ্তির অন্তরালে দাতাদের অন্তর্বাসনা উপলব্ধিতে সক্ষম বলেই তার প্রতিকার হিসেবে উপর্যুক্ত সামগ্রীর সদ্ব্যবহারে সচেষ্ট! তাই অচিরেই জব্বার মওলানার নামাঙ্কিত বইটি অবশেষে মুসল্লিদের তৎপরতায় মসজিদের বারান্দায় আবিস্কৃত হয়। শিরীন তার প্রদত্ত শাড়িসহ অন্য দুটি শাড়ি ভিখারিনীদের প্রদানের পাশাপাশি এরশাদ সাহেবের উপহৃত জড়োয়া গহনা একান্ন জন ভিখারী-ভিখারিনীর মধ্যে বন্টন করে। স্বাভাবিকভাবেই এসব ঘটনা নতুন মাত্রা সহযোগে মুখরোচক গুজবের মাধ্যমে ঠাটারিবাজার, বনগ্রাম, নবাবপুর, রায়সাবাজার, টিকাটুলি এবং দয়াগঞ্জে প্রচারিত হয়। প্রচণ্ড দাবদাহে যখন জনজীবন বিপর্যস্ত এবং 'পচা পশুর মৃতদেহের দুর্গন্ধে মহল্লার বাতাস ভারী হয়ে ওঠে, ... শিরীন আকতার প্রতিদিন সকালে বাড়ির নর্দমায় এক কাপ মেশক-এ-

আম্বর ঢেলে দেয় এবং এই আতর তাদের নর্দমা থেকে বেরিয়ে মহল্লার সব নর্দমার ভেতর দিয়ে গড়িয়ে যায়, তখন এই কথা একদিন লাল ইটের দালানের তিন ভাই শুনতে পায়' (জহির, ২০০৬ : ১০৫)। এভাবেই শিরীন তার অসামান্য দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত কামুক পুরুষদের উপঢৌকনের সদ্‌গতি সাধনের মাধ্যমে স্বীয় অভিপ্রায়কে মহল্লাবাসীর নিকট কৌশলে ব্যক্ত করে। কিন্তু এ পর্যায়েই সেলিমের প্রতি তার প্রেমময় আসক্তি সুতীব্র হয়ে ওঠে। কারণ, খরার দাবদাহে বাগানে ফুল না ফোটায় সেলিম শিরীনের সঙ্গে দেখা করতে দ্বিধান্বিত ছিল। অবশেষে একদিন গাঁদা ফুলের একটি কুঁড়ির পানে তাকিয়ে সারাদিন অতিবাহিত করে সন্ধ্যার পূর্বলগ্নে মলিন মুখে খালি হাতে সে শিরীনের বাসায় উপস্থিত হয়। প্রকৃতপক্ষে অপ্রস্ফুটিত অথচ বিকাশোন্মুখ ফুলকলিটি শিরীনের প্রতি তার ভালোবাসার প্রতীক, যদিও সে নিজেই এ সম্পর্কে ছিল অসচেতন। শিরীনের চিত্তলোকে সেলিম ইতোমধ্যেই প্রেমিকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ। তাই সেই সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবে চরম আবেগোন্মাদনার বশে যখন 'বাইশ বছরের অনিন্দ্যযুবতী মোহাম্মদ সেলিমকে আলিঙ্গন করে, ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়ে টেনে নামিয়ে তার শুকনো বাদামি ঠোঁটে চুম্বন করে ... তারা (তিন ভাই) তখন ভিতরে প্রবেশ করে মোহাম্মদ সেলিমের বাহুর ভেতর সুন্দরী শিরীনকে চুম্বনরত দেখে' (জহির, ২০০৬ : ১০৫)। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সেই রাতেই আবুর সঙ্গে শিরীনের বিয়ে তার পিতার সম্মুখেই সেলিমের উপস্থিতিতে জোরপূর্বক সংঘটিত হয়। শিরীনের স্পষ্ট প্রতিবাদ এবং বিবাহের 'না'-সূচক অসম্মতিকে মহল্লার পূর্বোক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গসহ অন্যদের 'হ্যাঁ'-সূচক সমর্থনের ঘটনায় সহজেই উন্মোচিত হয় অবক্ষয়িত এ সমাজের কদর্য চেহারা। পরদিন ভোরে সেলিমের মৃতদেহ শিরীনদের বাড়ির সম্মুখস্থ বৈদ্যুতিক বাতির খুঁটিতে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। এক পর্যায়ে তদন্ত কর্মের দায়িত্বপ্রাপ্ত দারোগার উক্ত হত্যাকাণ্ডসম্পৃক্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধকালে মহল্লাবাসীর পক্ষে তিন ভাইয়ের দ্বারা সংঘটিত বিবিধ দুষ্কর্মের খতিয়ান উপস্থাপন অসম্ভব বিবেচিত হয়। কারণ সেখানে আরো উপস্থিত ছিল তাদের যাবতীয় অপকর্মের মদদদাতা মহল্লার কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তিরা, যাদের ঘোষণায় তিন ভাই 'ভালো ছেলে' হিসেবে প্রশংসিত। সেলিমের বৃদ্ধা দাদির তিন মাস্তানকে অভিসম্পাতের ঘটনায় উক্ত দারোগার আচরণে নিষ্ক্রিয়তা প্রকট হয়। 'দারোগার কথা শুনে মহল্লার লোকেরা প্যান্টের পকেটে হাত গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকা তিন ভাই এবং অন্যান্য গণ্যমান্য লোকের দিকে তাকায়, তারা কিছু বলতে পারে না' (জহির, ২০০৬ : ১০৭)। সেকারণেই দারোগাও এমন মন্তব্য লেখার সুযোগ পায় 'কারো অভিযোগ নাই' (জহির, ২০০৬ : ১০৭)। অতঃপর ময়নাতদন্তের জন্য লাশ নিয়ে তাদের কর্মস্থলে এবং মহল্লাবাসীর ম্লানমুখে নীরবে খরা ও দুর্গন্ধের ভেতর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের ঘটনায় উন্মোচিত হয় ভূতের গলির জনজীবনের বিগলিত ও সন্ত্রস্ত রূপটি। বিশ শতকের শেষ দশকে রচিত এ গল্পে লেখক পুরনো ঢাকার প্রেক্ষাপটে ভূতের গলির বাসিন্দাদের সামূহিক জীবনযাত্রার যে পরিচয় উন্মোচন করেন, তা পারিপার্শ্বিক-সামাজিক অবক্ষয়, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গের স্বেচ্ছাচারিতা, পচনশীল আইন-কানুনের গোলকধাঁধায় শৃঙ্খলিত। সেখানে জনগণের জন্য যে বিধান প্রযুক্ত, তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অবস্থানে সমর্থ হয় মহল্লার সন্ত্রাসীরা; যাদের পৃষ্ঠপোষক হলো বুর্জোয়া সমাজপতি গোষ্ঠী। প্রকৃতঅর্থে, তারাই সমাজের নিয়ন্ত্রক এবং তাদের অঙ্গুলিহেলনমাত্র আইনের ধ্বজাধারী

পুলিশ সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরসাধনে বাধ্যগত। ক্রমস্ফীত পুঁজিবাদী সমাজের মূল চালিকাশক্তি হলো অর্থ। তাই এর বশীভূত হয়েই মহল্লার বখাটে যুবকদের পরবর্তী পর্যায়ে মাস্তান হিসেবে আবির্ভাব ঘটে। যেহেতু তাদের পেশীশক্তি ও অস্ত্রের দাপটে সাধারণ মানুষ শঙ্কিত, তাই তাদের অন্যায়ের, স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধভাবনায় তারা ভীত; নিজের অস্তিত্বসংকটে প্রতিনিয়ত দিশেহারা। লেখক ভূতের গলির বাসিন্দাদের ভঙ্গুর মনোভঙ্গির স্বরূপ নির্দেশের অভিপ্রায়ে সেলিমের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তাদের নীরব দর্শকের ন্যাক্কারজনক ভূমিকাকেও উপস্থাপন করেছেন। যে সমাজে নর-নারীর হার্দ্যিক প্রেম সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে চূর্ণীভূত হয় আইনকানুনকে প্রভাবশালী মহলের স্বীয় স্বার্থে যথেচ্ছ প্রয়োগের সুযোগে, তার সার্বিক বিপর্যয় সন্দেহাতীত। সেকারণেই পুলিশের পোশাক পরিহিত ব্যক্তির নীতিবোধ ও লোকদেখানো কৃতকর্মের বিস্তর ব্যবধানের স্বাভাবিক পরিণতি খুনী ভ্রাতৃত্রয়কে শাস্তি বা দণ্ডদানের জন্য গ্রেপ্তারের পরিবর্তে তাদের রক্ষাকারী মহল্লার প্রভাবশালী হর্তাকর্তাদের ঘোষিত চারিত্রিক প্রশংসা। মহল্লাবাসীর সমন্বিত সাক্ষ্যে সেলিমের হত্যাকারীদের চিহ্নিতকরণ ও বিচারকার্যে সম্পৃক্ততার সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ তাদের অন্তর্ভাবনায় নেই একের প্রতি অন্যের দায়বদ্ধতা। তারা বহুদিন ধরে একই মহল্লায় বসবাস করলেও স্বীয় অস্তিত্বের নিরাপত্তাগত তাগিদে অন্যের সংকটকে উপলব্ধির প্রচেষ্টায় অনাগ্রহী। এটিই পুঁজিবাদী সমাজের আভ্যন্তর সংকট, যেখানে প্রতিটি মানুষ চেতনালোকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং এর ভয়াবহ পরিণতিতেই তারা একসময় মানবিক সত্তা থেকে অবনমিত হয় যন্ত্রসত্তায়। ফলে সমাজে সংঘটিত ঘটনাসমূহের সঙ্গে তাদের সংযুক্তি নিছক পুতুলের মতো অক্রিয় ব্যক্তির। কোনো দায়বোধ বা প্রতিবাদ নয়, বরং দেখে-শুনে এবং প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়েও আপাতনিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালনই ভূতের গলির বাসিন্দাদের জীবনের বিকল্পহীনতায় পর্যবসিত হয়। রাষ্ট্রীয় বিধানসমূহের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের অনুকূল প্রতিবেশ গড়ে তোলার অক্ষমতার পাশাপাশি আইনের অপপ্রয়োগজনিত নেতিবাচকতা সমগ্র সমাজদেহকেই গ্রাস করে। ফলে জনমানসেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে, যার পরিণতি অত্যন্ত ক্ষতিকর ও সুদূরপ্রসারী। জনগণের সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ জীবনের অধিকারকে নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থার যথেচ্ছ দুর্নীতির সুযোগে, প্রতিপত্তিশালীদের স্বার্থোদ্ধারের তাগিদে কীভাবে আবু, হাবু ও শফিদের উত্থান ঘটে এবং সেলিমের মতো তরুণকে অকালেই রূপান্তরিত হতে হয় মৃতদেহে, সেই রূঢ় বাস্তবতা এ গল্পে বাস্তব রূপ পেয়েছে।

'কাঁটা'[১০] গল্পের প্রেক্ষাপট হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মুক্তিযুদ্ধকালীন বিপন্ন পরিস্থিতিতে জনজীবনে দুর্ভোগ, রাজাকারদের দৌরাত্ম্য, সংখ্যালঘু সংকট ও মুক্তিযোদ্ধা নিধন প্রসঙ্গ, স্বৈরাচারী সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা, হিন্দু-মুসলিমের বাবরী-মসজিদকেন্দ্রিক সহিংস প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি ঘটনার সমন্বয়ে জাতীয় জীবনের সার্বিক নৈরাজ্যকবলিত পরিস্থিতি। এতদঞ্চলের অধিবাসীদের বিপর্যস্ত মানসিকতার স্বরূপ উন্মোচনে তিনি সময়ের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকেন্দ্রিক বিভাজনকে বর্জনপূর্বক একের মধ্যে অন্যের অবাধ প্রবেশের অনুকূল সুযোগ সৃষ্টির জন্যও অবলম্বন করেছেন যাদুবাস্তবতাকে। কারণ জনমানুষের সামষ্টিক চেতনালোকে পুঞ্জীভূত অবক্ষয় তাদের নিক্ষেপ করে সময়ের

পারম্পর্যহীন গোলকধাঁধায়।[১১] একই মহল্লায় পাশাপাশি বসবাসরত হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজস্ব জীবনবোধ ও অস্তিত্বগত লড়াইয়ের তাৎপর্য কীভাবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও ধর্মীয় আধিপত্যের কারণে জনমনে পরস্পরের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোবৃত্তির বিস্তারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে, এটিই এ গল্পের কেন্দ্রীয় ভাববস্তু। তাই লেখক দেখিয়েছেন যে, ভূতের গলিতে ধারাবাহিকভাবে তিনবার ভিন্ন সময়ে আগত এক হিন্দু দম্পতির (ঐ মহল্লার অন্য সকল অধিবাসী মুসলিম) নাম সুবোধচন্দ্র ও স্বপ্না, সুবোধচন্দ্রের ভাইয়ের নাম প্রত্যেকবারই পরানচন্দ্র, উক্ত দম্পতি তিনবারই আবদুল আজিজ ব্যাপারির বাড়িতেই ভাড়াটে হিসেবে আসে, যেখানে রয়েছে একটি পাতকুয়া এবং প্রত্যেকবার সেটিই তাদের মৃত্যুস্থল (কখনো আবেগের আতিশয্যে দুর্ঘটনায় কবলিত হওয়ার বাধ্যবাধকতায়, কখনো পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিগত সংকটের অসহায়ত্বে, কখনো বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীদের রোষানলের শিকার হওয়ার নির্মম বাস্তবতায়)। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্ভাব্য পরিণতি বাংলাদেশ নামক স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্যায়ে কী হতে পারে এবং এক্ষেত্রে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাদের নির্মম পরিণতির অন্তরালে কোন সহায়ক উপাদানসমূহ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে — এসব জিজ্ঞাসার পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে জনজীবনের ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক রূপায়ণই গল্পটিতে লেখকের অভীষ্ট। উনিশশ চৌষট্টি সালে যখন ঢাকার কোনো কোনো এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল, তখন ভূতের গলির আজিজ ব্যাপারির বাড়ির ভাড়াটে স্বপ্নার এক বর্ষাস্নাত পূর্ণিমা রাতের মায়াবী পরিবেশে আবেগাপ্লুত হয়ে কুয়ার পাশে স্বামীর সঙ্গে গল্প করার এক পর্যায়ে হঠাৎ জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদ ধরতে গিয়ে কুয়াগহ্বরে সলিল সমাধিকে নিছক 'দুর্ঘটনা' বলা যায় না। সমগ্র গল্পের পরিসরে কুয়া যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্বহীনতার বধ্যভূমি, সেই বিবেচনায় কুয়ার কালো জলে প্রতিবিম্বিত পূর্ণিমার চাঁদ হলো অধরা অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদহীন মানবতাবাদের প্রতীক। এরই প্রতিষ্ঠাগত অক্ষমতায় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভূতের গলির বাসিন্দাদের পরবর্তী সময়ে কখনো পাক হানাদার বাহিনীর গুলিতে অসহায়ভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে, কখনো বা নিজেদের অন্তর্গত সংকীর্ণমনস্কতার প্ররোচনায় ঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। মূলত এ ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেই উক্ত মহল্লার অধিবাসীদের অবচেতনে পুঞ্জীভূত হতে থাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। তাই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দ্বিতীয়বার যখন সুবোধচন্দ্র-স্বপ্না দম্পতি আজিজ ব্যাপারির বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসে, তখন স্বাভাবিকভাবে তাদের মনোভূমিতেই সবচেয়ে তীব্রভাবে প্রকট হয়ে ওঠে অস্তিত্ব-সংকট। কারণ পাকিস্তানে তারা সংখ্যালঘু। তথাপি এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সংখ্যাগুরু মুসলিম প্রতিবেশীদের আন্তরিকতা ও সর্বাত্মক সহযোগিতার ফলে সেই দুর্যোগকালে পাক হানাদারদের কবল থেকে তারা রক্ষা পায়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে হানাদারদের দোসর মওলানা আবুবকর রাজাকার ও তার অনুগত শিষ্যদের অপতৎপরতায় যখন মহল্লাবাসী পুরুষদের সম্ভ্রম (লুঙি উন্মোচনপূর্বক খতনা করানোর নিদর্শনের চরম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে) বিপন্নতার সম্মুখীন হয়। সেই সংকটাপন্ন মুহূর্তে পাক হানাদারদের রাইফেলের সামনে দণ্ডায়মান জনৈক মহল্লাবাসীর ধাক্কায় সুবোধচন্দ্র কুয়ায় পতিত হয়ে এবং অপর তিনজন বাসিন্দা রাইফেলের গুলিতে মৃত্যুবরণ করে। এ ঘটনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় মহল্লাবাসী শোকের প্রাবল্যে তিনটি মৃতদেহকে সৎকারের আয়োজনে

সুবোধচন্দ্রের কথা বিস্মৃত হলে সবার অগোচরে তার স্ত্রী স্বপ্না স্বামীহীন নিঃসঙ্গ জীবনের অবসান ঘটাতে কুয়ায় আত্মহত্যা করে। অবশেষে মহল্লাবাসীর যখন সুবোধচন্দ্রের কথা স্মরণ হয়,

> তারা পরবর্তী সময়ে বলে যে, এটা একটা মারাত্মক ভুল ছিল। ... মহল্লার লোকেরা তখন বিচলিত হয়ে পড়ে এবং কুয়োর ভেতর দড়ি বেঁধে হুক নামানো হলে তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর জোড়া লাশ উঠে আসে। এই জোড়া লাশ নিয়ে মহল্লার লোকেরা সেদিন বিমর্ষ, বিপন্ন এবং বিপর্যস্ত বোধ করে, ... সেই চোখে বিষণ্নতা এবং দুঃখ, ক্ষোভ এবং ঘৃণা কোনো কিছুই হয়তো ছিল না এবং তারা বলে যে, তার (পরানচন্দ্র) নির্লিপ্ততায় তাদের ভেতরকার গ্লানি ফিরে আসতে থাকলে তারা যখন প্রায় অসহায় হয়ে ওঠে তখন লোকটি বলে যে, তার নাম পরানচন্দ্র দাস। (জহির, ২০০৬ : ১২১-১২২)

উপর্যুক্ত ঘটনাদ্বয়ের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ায় মহল্লাবাসীর অবচেতনে সংগুপ্ত অপরাধবোধের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় যখন আশির দশকের দ্বিতীয় সামরিক শাসনকালে ভূতের গলিতে আজিজ ব্যাপারির বাড়িতে পুনরাবির্ভাব ঘটে উক্ত দম্পতির। এর ফলে ভূতের গলির বাসিন্দাদের আচরণে পুনঃপ্রকাশিত হয় বিভ্রান্তি এবং ভীতিবোধ; এ কারণে যে, উক্ত দম্পতি হয়তো আবার কুয়ায় পতিত হবে। তাই 'মহল্লায় সুবোধ ও স্বপ্নার আগমনে তাদের ব্যস্ত বিপর্যস্ত জীবনের ভেতর এক ধরনের অসহায়তা এবং অপরাধবোধ জেগে ওঠে' (জহির, ২০০৬ : ১০৯)। অবশেষে উক্ত দম্পতির সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে তাদের আশাভঙ্গ ঘটে, কারণ অতীতের মতো এবারও সুবোধ ছোট ভাইয়ের নাম পরান, এবং যথারীতি চা পরিবেশনের মাধ্যমে অতীতের মতো এবারও স্বপ্না তাদের আপ্যায়ন করে। বাড়িওয়ালা আব্দুল আজিজকে মহল্লাবাসী মাটি দিয়ে কুয়া বন্ধ করার অনুরোধের পাশাপাশি সুবোধকেও সতর্ক করে। কিন্তু ধর্মীয় উস্কানির মতো সংবেদনশীল ঘটনার ভয়াবহতায় অবশেষে তাদের দ্বারাই সেই দম্পতির মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ায় সুবোধ-স্বপ্না দম্পতির মিষ্টি খাওয়ার উল্লাস-সম্পর্কিত গুজব মহল্লায় পল্লবিত হলে —

> এক প্রবল বিভ্রান্তির ভেতর উত্তেজিত মানুষের এক বিরাট দল আব্দুল আজিজ ব্যাপারির বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে 'আলাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। সেদিন ভূতের গলির লোকেরা সুবোধচন্দ্র এবং তার স্ত্রী স্বপ্নার খাওয়ানো নিমকপারার কথা ভুলে যায় এবং এই জনতা যখন আজিজ ব্যাপারির বাসা ত্যাগ করে যায় তখন সুবোধচন্দ্র এবং স্বপ্নাকে কুয়োর ভেতর পাওয়া যায়, মৃত (জহির, ২০০৬ : ১২৫-১২৬)।

অতঃপর বাস্তব আর বিভ্রান্তির মিথস্ক্রিয়ায় শৃঙ্খলিত মহল্লাবাসীর চেতনালোকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভেদরেখা বিলুপ্ত হওয়ায় তাদের আচরণেও পরিলক্ষিত হয় সামঞ্জস্যহীনতা। তাই তারা আজিজ ব্যাপারির বাড়ির কুয়া কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে বন্ধ করলেও তাদের মনোজগতে সেটি নতুন রূপে অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে। সেকারণেই ভবিষ্যতেও পুনরায় সুবোধ-স্বপ্না দম্পতির পুনরাবির্ভাবের আশঙ্কা এবং কুয়াগহ্বরে পতিত হওয়ার ভয়ে কখনো কখনো কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে উক্ত মহল্লাবাসী আকস্মিকভাবেই আজিজ ব্যাপারির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে কুয়ার গহ্বর বন্ধ করতে চাইলে তার বিস্ময়বোধ চরমে ওঠে। কারণ মহল্লায় ইতোমধ্যেই কলের লাইনের পানির ব্যবস্থা হয়েছে। সময়ের পরম্পরা

থেকে বিচ্যুত মহল্লাবাসীর চিত্তলৌকিক সংকটই সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিক্রিয়াশীল মনোভঙ্গির সম্মিলনে তাদের অবচেতনলোকে সংগুপ্ত অবক্ষয়ের কুয়ায় অবরুদ্ধ করে; যা থেকে তাদের পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। তাই অতীতের দুর্বিষহ ঘটনাগুলোকে তারা জোরপূর্বক উপড়ে ফেলতেও ব্যর্থ হয়। কারণ, 'তখন তাদের আব্দুল আজিজ ব্যাপারির বাড়ির প্রাঙ্গণে লাগানো স্বপ্নার তুলসী গাছটির কথা মনে পড়ে, তারা আজিজ ব্যাপারির বাড়িতে যায় এবং দেয়ালের কিনারায় মৃদু বাতাসের ভেতর তুলসী গাছটিকে দেখে; এবং তখন তাদের কুয়োটির কথা মনে পড়ে' (জহির, ২০০৬ : ১২৭)। পুরনো ঢাকার ভূতের গলির বাসিন্দাদের অন্তর্জাগতিক সংকটের স্বরূপ নির্দেশ প্রসঙ্গে লেখক এ গল্পে স্থান, পাত্র-পাত্রীদের সামাজিক ও পারিবারিক পরিচিতি, তাদের অভ্যাস ও সংস্কারগত প্রবণতাসমূহের অপরিবর্তিত ধারাবাহিক প্রয়োগের পাশাপাশি সময়ের নির্ধারিত কাঠামোকে লঙ্ঘনপূর্বক বিভিন্ন তলের বিশৃঙ্খল রূপের সমন্বয়ে যাদুবাস্তবতাকে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তবে এ গল্পে তাঁর অভীষ্ট নিঃসন্দেহে ভিন্ন কোনো ভাবনা। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সাতচল্লিশের দেশবিভাগের বিষবাষ্প ধর্মান্ধতার মোহে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার প্রাচীর গড়ে তুলেছিল। তারই অনির্দেশ্য ও অনভিপ্রেত সম্প্রসারণ স্বাধীন বাংলাদেশে বিশ শতকের আশির দশকে কতোটা ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে, এ গল্পে 'কাঁটা'র প্রতীকে লেখক বারবার সে প্রসঙ্গকে ইঙ্গিতবহ করেছেন। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের সমান্তরালে এতদঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবতার আকাশ-পাতাল ব্যবধানের নবভাষ্য নির্মাণে গল্পটি পুরনো ঢাকার সীমিত পরিসরেও সামগ্রিকতার অসীম ব্যঞ্জনায় স্পন্দিত। সাম্প্রদায়িকতাকেন্দ্রিক অসংখ্য গল্প, উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যে রচিত হলেও 'কাঁটা' এক্ষেত্রে প্রাতিস্বিক মর্যাদায় উত্তীর্ণ। গল্পে সন্নিহিত বিষয়বস্তুর অসামান্য উপস্থাপনরীতি, ঘটনাস্রোতের কুশলী বয়ানভঙ্গি ও সময়ের অভিঘাতে মহল্লাবাসীর সমষ্টিচেতনায় সংগুপ্ত সাম্প্রদায়িকতার হলাহলে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হওয়ার অনতিক্রম্য অন্তর্বাস্তবতার শিল্পায়নে নিঃসন্দেহে এটি শহীদুল জহিরের প্রতিনিধিত্বশীল রচনাসমূহের অন্যতম।

'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' গল্পে দক্ষিণ মৈশুন্দির একটি মহল্লা বিস্তৃত পরিসরে উপস্থিত, যেখানে সংলাপের স্বল্প প্রয়োগ ও অসংখ্য চরিত্রের পারস্পরিক সংযুক্তিগত বুননে নির্মিত হয় ঐ এলাকার জনজীবনের সামগ্রিক রূপ। একটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত গল্পটির পরিসমাপ্তি অংশে পূর্ণযতির পরিবর্তে কমা ব্যবহারের মাধ্যমে লেখক নিশ্চিত করতে চেয়েছেন এর উন্মুক্ত বা খোলা পরিণতি। 'আমরা' বা নামহীন সমষ্টিমানুষের প্রেক্ষণবিন্দুকে অবলম্বন করে তিনি এ গল্পে বিন্যস্ত করেন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিশিষ্ট আবহ ও জীবনচর্যার একান্ত নিজস্ব ধরনটি। হাইস্কুলের গণ্ডি অতিক্রমপূর্বক দক্ষিণ মৈশুন্দির গ্লাস, বিস্কুট, লজেন্স, পাউরুটি, নাটবল্টু প্রভৃতির কারখানার শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হাফপ্যান্ট পরিহিত উঠতি বয়সের বিবাহিত তরুণরা এ গল্পে 'আমরা' হিসেবে পরিচিত, যাদের নিত্যদিনের জীবনযাত্রা শুধুই নিজস্ব সংসারের বলয়ে আবর্তিত নয়। বরং পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে তাদের প্রাত্যহিক কর্মপ্রণালির সুদীর্ঘ অংশই অতিবাহিত হয় মহল্লাবাসীর সমন্বিত

মনোভঙ্গির বিবিধ প্রান্ত উন্মোচনের ক্লান্তিহীন তৎপরতায়। লেখক নামহীন এ তরুণদলের মাধ্যমে পুরনো ঢাকার অধিবাসীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়কে অকপটে বিশেষ কৌশলে রূপায়িত করেছেন। গল্পের প্রারম্ভ থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত তরমুজের মতো অতি পরিচিত একটি ফলকে কেন্দ্র করে তাদের বিচিত্র ভাবনার বহিঃপ্রকাশ এ বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনিবহ। দক্ষিণ মৈশুন্দিতে ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কুটির শিল্পের তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন হলো 'হাজি ফুড প্রডাক্টস কোম্পানি' যা স্থাপনের উদ্দেশ্য তরমুজ বাজারজাতকরণ। গল্পের প্রারম্ভে জানা যায়, গ্রীষ্মের দাবদাহে চৈত্র, বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে তরমুজওয়ালাদের আবির্ভাবে সমগ্র মহল্লায় সৃষ্টি হয় জটলাবিশেষ। কারণ 'তরমুজওয়ালারা মহল্লার গলির সংকীর্ণ একটি জায়গাতে মাটিতে দেয়ালের পাশ ঘেঁষে, গোল গোল তরমুজের ছোট ছোট ঢিবি বানিয়ে বসে ... ফলে এই জায়গায় এসে রিকশা, ঠেলাগাড়ি, গরুর গাড়ি, বেবিটেক্সি, কুকুর, বেড়াল, ছাগল এবং মানুষ একটি জট পাকিয়ে ফেলে' (জহির, ২০০৮ : ১১৩)। তরমুজের গন্ধ ও রসের নেশায় আপ্লুত 'নীল, মোটা মাছি এবং কালো সরু মাছি'-র (জহির, ২০০৮ : ১১৩) উৎপাত তরুণদের নিকট বিরক্তিকর বিবেচিত হয়। তথাপি তরমুজ সম্পর্কে তাদের কৌতূহলে ঘাটতির পরিবর্তে সঞ্চার ঘটে সীমাহীন আগ্রহের। সেকারণেই হাতের তালুতে তরমুজ নিয়ে এর ওজন পরীক্ষার পাশাপাশি সেটির অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের অসীম ধৈর্যে সুস্পষ্ট হয় তাদের আপাত তুচ্ছ বিষয়েও সীমাহীন উৎসাহের স্বরূপ এবং মন্থর সময় অতিবাহিত করার অনায়াস প্রচেষ্টা।

> তরমুজ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাড়ে, কারণ, তরমুজের রসের গন্ধে মাছি বেড়ে যায় এবং মাছি আমাদের নাকের ভেতর প্রবেশ করে; আমাদের হাঁচি হয় এবং আমরা হাঁচি দেয়ার শারীরিক যৌন আনন্দকে আবিষ্কার করি, আমাদের জীবনে তিনটি জিনিস আমরা সনাক্ত করতে পারি, লেদ মেশিন, তরমুজ এবং মস্তিষ্কের শিকড়ের গোড়া থেকে উঠে আসা হাঁচি দেয়ার আনন্দ; (জহির, ২০০৮ : ১১৫)

তরমুজ সম্পর্কে তাদের দুর্বার আকর্ষণের পরিধি বিস্তৃত হয় সংসারের অন্তঃপুর পর্যন্ত। সেখানে তরমুজের নির্ভেজাল স্বাদ ও বর্ণগত বিশুদ্ধতা সম্পৃক্ত সংশয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় তাদের স্ত্রীদের আবেগ-অনুভব। কিন্তু অচিরেই তরুণদের নিকট উন্মোচিত হয় মানুষের কলিজার মতো টকটকে তরমুজের অন্তর্রহস্য এবং বিক্রেতাদের ব্যবসায়িক বুদ্ধির সূক্ষ্ম কৌশল। সাদা তরমুজের ভেতর লাল রং ও চিনির সিরাপের প্রলেপে চমৎকৃত মহল্লাবাসীর দীর্ঘদিনের আস্থায় অবশেষে কুঠারাঘাত পড়ায় 'বেশি জ্ঞানের অসুবিধার দিকটি আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়, জ্ঞান আমাদের মনের এতদিনকার শান্তি নষ্ট করে দেয়' (জহির, ২০০৮ : ১২০)। এর প্রতিকারার্থে মহল্লার যুবক মামুনের তরমুজওয়ালাদের প্রতি ভেজালের অভিযোগও অন্তিমপর্যায়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এর সমান্তরালবর্তী আরেকটি ঘটনায়। যখন জনৈক তরমুজবিক্রেতা তরমুজের কৃত্রিম রং ভ্রান্ত প্রমাণ করতে 'দেয়ালের গা থেকে এক চিমটি শেওলা তুলে নিয়ে মামুনের শার্টে ঘষে দেয় এবং সাদা শার্টে লাল দাগের পাশে সবুজ রঙের একটি দাগ হয়ে যায়, এবং সে বলে এ্যালা? ... তখন আমাদেরও কিছু বলার থাকে না' (জহির, ২০০৮ : ১২১)। সেকারণেই গ্রীষ্মের দাবদাহে

অতিষ্ঠ হয়ে তারা পুনরায় তরমুজের আসক্তিতে নিমগ্ন হয়। এক পর্যায়ে আলমগীর হোসেন কথিত আখ্যান (তরমুজ সম্পর্কিত) শোনার ফলে তাদের স্ত্রীরা তরমুজকে খাদ্যতালিকা থেকে পরিহার করে। পাশাপাশি বিক্রেতাদের মাধ্যমে এর মূল্য বৃদ্ধির পরিণতিতে মহল্লার তরুণদের শীতল তরমুজের শরবত পানে বিঘ্ন ঘটে। অবশেষে হাজি আবদুর রশিদ মহল্লাবাসীকে সম্ভাব্য ক্রেতা বিবেচনাপূর্বক মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তরমুজ খাওয়ার আক্ষেপ নিয়ে এর ব্যবসায়িক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গেই সংক্ষেপে বিশ্লেষিত হতে পারে ব্যবসায়ী হাজি আব্দুর রশিদের অন্তঃসত্তার স্বরূপ। ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন এ ব্যক্তি ব্যবসায়িক কার্যক্রম বিস্তারের প্রয়োজনে প্রতিবেশী বিধবা বৃদ্ধা রহিমা বিবির দেড় কাঠার ভিটাবাড়ি দখলে সচেষ্ট। 'তরমুজের বিচি খেয়ে ফেলার পর পেটে যে ব্যথা হয়, সেই ব্যথার পর হাজি আব্দুর রশিদের অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত হয়' (জহির, ২০০৮ : ১১৫)। তাই মৃত্যুর পূর্বে সে তরমুজের ব্যবসা করতে বড় ছেলেকে আদেশ দেয়। এতদুদ্দেশ্যে 'তার মনে হয় যে, নিঃসন্তান বিধবা, বৃদ্ধা রহিমা বিবির দেড় কাঠার বাড়িটা তার প্রয়োজন' (জহির, ২০০৮ : ১১৫)। তবে রহিমা বিবির সম্পত্তি দখলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও 'হাজি আবদুর রশিদ মহল্লায় লেদ মেশিন বসানোর পরিকল্পনা ত্যাগ করে নাই, তরমুজ অথবা তরমুজের বিচি খেয়ে বিছানায় পড়ে থাকার সময় সে তার পরিকল্পনার ছক গুছিয়ে নেয়' (জহির, ২০০৮ : ১১৭)। তার সেজ ছেলে আব্দুল জলিলের লজেন্স কারখানার কর্মকাণ্ড উদ্বোধনের প্রারম্ভে মহল্লাবাসীর উদ্দেশে মিলাদের আয়োজনে শরীক হয় গল্পকথক 'আমরা'। তারা ভাগ পায় উৎপাদিত লজেন্স ও জিলাপির, এবং এভাবেই —

> তার (আব্দুর রশিদ) মৃত্যু আমাদের মহল্লায় আর এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে, দক্ষিণ মৈশুন্দিতে 'হাজি ফুড প্রডাক্ট কোম্পানি' প্রতিষ্ঠিত হয় কেবলমাত্র তরমুজ কৌটাজাত করার জন্য ... মৃত্যুশয্যাতেও হাজি আবদুর রশিদের চিন্তা করতে পারার ক্ষমতা পরিষ্কার ছিল, তখন তিনি সঙ্কটের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারেন এবং বড় ছেলে রইসুদ্দিনকে বলেন, একটা তরমুজের ফ্যাক্টরি বসাও, তারপর তিনি মারা যান; (জহির, ২০০৮ : ১৩১)

উক্ত মহল্লার নর-নারীর প্রণয়সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে রহিমা বিবির ভাগ্নে আবদুল গফুরের তিন ছেলে-মেয়ে শেফালি, আজিজুল হক ও আমিনুল হকের মাধ্যমে। তারা প্রেমের অবারিত আহবানে সাড়া দিতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মহল্লাবাসীর সঙ্গে হৃদ্যতাসূচক সম্পর্কের বন্ধন থেকে, হারিয়ে ফেলে জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণময় প্রান্ত। শুধু তাই নয়, সন্তানদের যথেচ্ছ আচরণের জন্য সামাজিক মান-সম্মান হানি হওয়ায় ক্ষোভ, অপমান ও অসহনীয় অন্তর্দাহের পীড়নে একপর্যায়ে তাদের জনক আব্দুল গফুর আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ হয়। মহল্লার উঠতি বয়সের তরুণদের আবেগায়িত চিত্তে শেফালি প্রথম আবির্ভাবেই দুরন্ত উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটায়। অনুরাগের উন্মাদনাবশতই একদিন সেই উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী মহল্লা ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় অগ্রসর হয়। বাংলাবাজার স্কুলের নীল রঙের স্কুল পোশাক পরিহিত শেফালির হাস্য-পরিহাস, কৌতুক ও ঈষৎ চাপল্যের অন্তরালে তার সংবেদনশীল সত্তার পরিচয় আবিষ্কারে অক্ষম মহল্লার তরুণদের নিকট সে অধরা নারী হিসেবেই প্রতিভাত। এ গল্পের 'আমরা' অর্থাৎ নামহীন তরুণদের শেফালির প্রতি রোমান্টিক অনুভবের ব্যর্থ প্রয়াস যেন 'কাঁখের পিতলের কলস পড়ে যাওয়ার মতো' (জহির, ২০০৮ : ১১৫) বিস্ময়কর অথচ অস্বস্তিদায়ক ঘটনা। তাই তাদের বিষণ্ন উপলব্ধি

— 'আমরা এই পতনের শব্দ শুনতে পাই, এজন্য আমাদের কোনো আনন্দ কিংবা দুঃখ হয় না, আমাদের মনে হয় যে এই পতন অনিবার্য ছিল' (জহির, ২০০৮ : ১১৫)। শেফালির স্বেচ্ছায় মহল্লা পরিত্যাগপূর্বক অন্য কোনো যুবকের দয়িতা হিসেবে নিজেকে বিবেচনার প্রসঙ্গটি তাদের নিকট রীতিমতো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী অবিশ্বাসী প্রেমিকার হঠকারী সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হয়। এ প্রসঙ্গে তাদের ভাবনা — 'আমরা শেফালির বেইমানির কথা ভুলতে পারি না, আমরা সেই মানুষটিকে বের করতে পারি না যার সঙ্গে সে চলে যায়, এবং আমাদের মনে হয় যে, একই মহল্লায় থেকে সে আমাদের ঠকায়' (জহির, ২০০৮ : ১১৭)। শেফালির প্রতি তাদের এ অধিকারবোধের ভাবনা শুধু অযৌক্তিক ও হাস্যকরই নয়, বরং নীতিহীনও বটে। কারণ তারা বিবাহিত এবং সংসারে স্ত্রী থাকতেও শেফালির প্রতি উপর্যুক্ত মনোভঙ্গিতে তাদের বহুগামী চারিত্র্যই নির্দেশিত হয়। শুধু তাই নয়, শেফালি ছাড়াও মহল্লার হিন্দু তরুণী ঝর্ণা বসাকের প্রতিও তাদের অনুরূপ আবেগের অকপট বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু তাকেও না পাবার বেদনায় 'আমাদের এক প্রকার দুর্বোধ্য শোক হয়' (জহির, ২০০৮ : ১১৭)। গ্রাজুয়েট স্কুলের শিক্ষক ননী বসাকের তরুণী কন্যা ঝর্ণা যখন মহল্লার আটপৌরে, নোনা-ধরা চুন, সুরকির অপরিচ্ছন্ন দালানের সংকীর্ণ পরিসর থেকে মুক্ত হয়ে চলচ্চিত্রের রূপালি পর্দায় নায়িকার ভূমিকায় উত্তীর্ণ, তখন মহল্লার উঠতি বয়সের তরুণদের আক্ষেপের সীমা-পরিসীমা থাকে না। কারণ মহল্লায় যে নারীর সঙ্গে প্রেমের দু-দণ্ড সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত, গাঁটের পয়সা খরচ করে রূপমহল প্রেক্ষাগৃহে তাকেই একবার দেখার জন্য তাদের চিত্তচাপল্য দিনের পর দিন বিস্তৃত হয়। এর পাশাপাশি পূর্বের মতোই জাগে প্রবঞ্চনাজাত হতাশা — 'তাকে দেখে আমাদের বিষণ্নতা বেড়ে যায়, কারণ আমরা বুঝতে পারি যে, কি অসাধারণ সুন্দরী সে, কিন্তু সে আমাদের নয়, আমাদের মনে হয় যে, ফিল্মের নায়িকা হয়ে যাওয়ায় আমরা তাকে হারাই' (জহির, ২০০৮ : ১১৯)। আবদুল গফুরের কলেজ পড়ুয়া যুবকপুত্র ও স্বভাবে কবি আজিজুল হকের স্বপ্নকন্যা ঝর্ণা কখনোই মাটির মানবীরূপে উপর্যুক্ত তরুণদের প্রেমিকারূপে আবির্ভূত হয় না। তথাপি সেই লাস্যময়ী নারীকে মনোভূমিতে কল্পনার মানসীরূপে অধিষ্ঠানের অবিরাম প্রচেষ্টায় আজিজুল হকের ভাবাবেগসর্বস্ব কবিতা রচনার অন্তিম পরিণতি হলো উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় পাবনার মানসিক বৈকল্যগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসালয়ে আশ্রয় প্রাপ্তি।

ভ্রাম্যমাণ সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান পুরনো ঢাকার জনমানসের অবচেতনলোকে সংগুপ্ত থেকেও তাদের নিত্যদিনের যাপিত জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কারণ সংস্কৃতির মৌল বৈশিষ্ট্যই হলো, এটি সময়ের সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে বিকাশমান এবং নিয়তই পরিবর্তনশীল। যে কোনো সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার, কল্পনা, স্বপ্ন, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিক অনুশাসন প্রভৃতির মিথস্ক্রিয়ায় উদ্ভূত সংস্কৃতির নিজস্ব রূপটি সেই জনপদের সমষ্টিমানুষের অন্তর্লোকে সততই প্রোথিত থাকে। এ গল্পেও দক্ষিণ মৈশুন্দির অন্তর্গত ভূতের গলির তরুণদের অবচেতনে ক্রিয়াশীল যৌন-ভাবানুষঙ্গসমূহের অবাধ বিস্তার আভাসিত হয় সাপ ও নারীর দ্বৈত প্রতীকে। তাই সাপকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র দর্শনে তাদের মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহের অন্তরালে সক্রিয় থাকে নারী-পুরুষের কামজ সম্পর্কের প্রতি তীব্র আসক্তি। অর্থের বিনিময়ে দর্শকের চিত্তবিনোদনই চলচ্চিত্রের মুখ্য অভীষ্ট। তাই এতে বাস্তবতা ও যুক্তির সমান্তরালে অলীক কল্পনানির্ভর অবাস্তব ঘটনারাজি ও চরিত্রসমূহের

অবিশ্বাস্য, মনোরঞ্জক উপস্থিতি একান্তই স্বাভাবিক। সেকারণেই চলচ্চিত্রে রূপায়িত ঘটনাসমূহের প্রভাবও উঠতিবয়সী তরুণদের মনোলোকে সংযোজন ঘটায় নবতর বিশ্বাস ও ধারণার। সাপের দংশনে আমিনুল হকের মৃত্যুর ঘটনা তাদের অবচেতনে পুঞ্জীভূত ধারণাসমূহের সন্নিবেশে নতুন কাহিনীর উদ্ভব ঘটায়। আকস্মিকভাবে এক রাতে প্রেমোন্মাদনাবশত হাস্নাহেনার ঝোপের নিকট পুতুলের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় রাতের অন্ধকারে সাপের দংশনে তার মৃত্যু ঘটে। এ ঘটনাটি তরুণদের মনোলোকে ভিন্ন মাত্রায় গ্রথিত হয়। 'নাগিনীর প্রেম' চলচ্চিত্রে রূপায়িত অযৌক্তিক বিশ্বাসের অনুসরণে ['অনেক সাপ, নারী হয় এবং অনেক নারী, সাপ' (জহির, ২০০৮ : ১২৮)] মহল্লার তরুণরা এ সিদ্ধান্তে স্থিত হয়, 'নারী সাপেরা সবসময় পুরুষদের ভালবাসে, নাগিনীরা প্রেম করে এবং প্রেমে পড়লে তারা ভয়ঙ্কর হয়ে যায়' (জহির, ২০০৮ : ১২৯)। সেকারণেই তারা আমিনুল ও পুতুলের প্রেমের পরিণতিকে এভাবে বিবেচনায় সচেষ্ট হয় —

> আমিনুল হক এই ছবিটি দেখে নাই, কারণ, আমাদের মনে হয় যে, এটাই নিয়ম, যার জীবনে যা ঘটবে সে সে-বিষয়ে জানবে না, কিছু দেখবে না, তা না হলে ঘটনার আগে সকলেই সব কিছু জেনে যেত এবং ঘটনাই ঘটতে পারতো না; আমরা জানতে পারি যে, আমিনুল হকের জীবনে এক অর্ধেক নারী এবং এক পূর্ণাঙ্গ সাপ এসে দাঁড়ায়, আমরা বুঝতে পারি যে, দুজনেই আসে ফুলের গন্ধ এবং বাঁশির সুরের টানে। (জহির, ২০০৮ : ১২৯)

বাঁশির মোহনীয় সুরের পাশাপাশি হাস্নাহেনার মাতাল সুঘ্রাণে এক নাগিনী আমিনুল হকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অবতীর্ণ হয় পুতুলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় — সমগ্র বিষয়টি অবাধ কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয়ে মহল্লার অধিবাসীদের গালগল্প রচনার প্রচেষ্টামাত্র। কেননা, যে সাপের দংশনে আমিনুল হকের মৃত্যু ঘটে, সেটি পুরুষ নাকি নারী তা নির্ধারণের কোনো সুযোগ ছিল না। তাছাড়া, সাপ যে মানুষের প্রতি প্রেমানুভবে আগ্রহী ও সমর্থ, বিষয়টি নেহাতই অবাস্তব। সর্বোপরি, সাপটি আমিনুলের প্রেমে পড়লে সেটি প্রেমিককে নয়, বরং প্রবল ঈর্ষাবশত পুতুলকেই দংশন করত। কিন্তু তেমনটি ঘটেনি। কারণ 'পা-কে রক্ষা করা কঠিন, গর্তে পড়ে ভাঙে, কুকুর/সাপ কামড়ে দেয়, পা থাকার কারণেই আমিনুল হক মারা পড়ে' (জহির, ২০০৮ : ১২৮)। অর্থাৎ রাতের অন্ধকারে হাস্নাহেনার ঝোপে প্রেমমগ্ন অবস্থায় সাপের দেহে আমিনুল হকের পা সঞ্চালিত হয়। অতঃপর আত্মরক্ষার জৈবিক প্রচেষ্টায় তার দংশনের ফলে বিষক্রিয়ায় আমিনুলের মৃত্যু ত্বরান্বিত হয় – উপর্যুক্ত অভিমত একান্তই বিজ্ঞানসম্মত। স্মর্তব্য, গল্পকথক তরুণেরা উপর্যুক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নয় এবং সমগ্র ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে তারা অন্যদের নিকট হতে এ সম্পর্কে অবহিত হয়।

> আমরা শুনতে পাই যে, সে (আমিনুল হক) সাপের কামড়ে মারা যায়; আমরা পরে জানতে পারি যে, একটি সাপিনী প্রেমে কাতর ছিল এবং সাপিনীরা প্রেম ভাগ করে নিতে জানে না, আমিনুল হক যখন দেয়াল টপকে পুতুলের কাছে যায়, সে তখন হাস্নাহেনার ঝোপের কাছে অপেক্ষা করে; আমরা বুঝতে পারি যে, সাপিনীর এই প্রেম হয়তো একতরফা ছিল, এবং একতরফা প্রেম কতো প্রবল হতে পারে তা আমরা জানতে পারি। (জহির, ২০০৮ : ১৩০)

এভাবেই বাস্তব ও বিভ্রম, যুক্তি ও কল্পনার সম্মিলনে এতদঞ্চলের সমষ্টিচেতনায় গড়ে ওঠে

এক ভিন্নতর পরিমণ্ডল। চিত্তবিনোদনের অন্যতম অবলম্বন চলচ্চিত্রের আশ্রয়ে মহল্লার উঠতিবয়সের তরুণদের চেতনালোকে অনুসৃত মূল্যবোধ, জৈবিক সংবেদনারাশির উদ্দীপনা, অন্তর্গত কল্পনা ও রূঢ় বাস্তবতার টানাপড়েন যেভাবে আবর্তিত হয়, তা তাদের জীবনের স্বকীয় প্রান্ত। নাইট শোতে 'বেহুলা', 'নাগিনীর প্রেম' অথবা স্কুল পালিয়ে বলাকা প্রেক্ষাগৃহে 'এন্ড হোয়েন সি ওয়াজ গুড' দেখার দুর্দান্ত আগ্রহের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের ভূমিকা পালন করে তাদের অবচেতনে সুপ্ত যৌনতাবাহী অনুষঙ্গসমূহ। বয়ঃসন্ধির গণ্ডিতে আবদ্ধ তরুণদের দাম্পত্য আচরণ, পারস্পরিক আড্ডা ও অশ্লীল রসিকতায় প্রাধান্য বিস্তারকারী উপর্যুক্ত প্রসঙ্গের বাহক হিসেবেও চলচ্চিত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

> আমাদের স্ত্রীরা তরমুজ ছোট চৌকো করে কেটে বাটি ভরে নিয়ে আসে, আমরা টুকরো তুলে মুখে দিই, আমাদের মুখের গর্তের ভেতর অল্প চাপে হাওয়াই মিঠাইয়ের মতো গলে যেতে থাকে তরমুজ এবং হাতের ভেতর নারী; এক হাতে তরমুজের বাটি, অন্য হাতে যুবতী স্ত্রীর একটি স্তন ধারণ করে আমরা পৃথিবীর গোলাকার বস্তুর মর্ম বুঝতে পারি; ...আমরা এই ছবির ইংরেজি কথাবার্তা বুঝতে পারি না, ...আমাদের পিতারা চুমুর দৃশ্যওয়ালা ছবি দেখার জন্য আমাদের গাল দিলেও আমরা দেখতে পাই যে, জীবনে কত কিছু শেখার আছে;.. শেভ করতে গিয়ে গাল এবং গালের নিচে ক্রমাগতভাবে কেটে যেতে থাকলে ইংরেজি ছবি দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগে,...এক তরমুজে তখন দুই কাজ হয়, দাড়ি শেভের অনুশীলন এবং খাওয়া, আমরা তরমুজের গায়ে সাবান লাগিয়ে রেজর দিয়ে এই ফেনা পরিষ্কার করে তুলে আনি তরমুজের গায়ে আঁচড় না লাগিয়ে, এবং দাড়ি কাটার ব্যাপারে আমরা দক্ষ হয়ে উঠি, (জহির, ২০০৮ : ১২১-১২২)

উক্ত মহল্লাবাসীর সুবিধাবাদী মানসিকতার প্রান্ত উন্মোচিত হয় দোলাইখাল এলাকায় উপপ্রধানমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীর বিবৃত ভাষণে দক্ষিণ মৈশুন্দির নাম অন্তর্ভুক্তিগত তৎপরতায়। ক্ষুদ্র শিল্প নির্মাণগত প্রচেষ্টায় ভূতের গলির বাসিন্দাদের ভূমিকা প্রশংসাযোগ্য। এমত বিবেচনায় মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি মালিক সমিতির দক্ষিণ মৈশুন্দি শাখার সভাপতির প্রচেষ্টায় মন্ত্রীদ্বয়ের ভাষণে এতদঞ্চলের নাম অন্তর্ভুক্তি মহল্লাবাসীর গর্বের স্মারক বিবেচিত হয়। এভাবেই সমগ্র গল্পটি হয়ে ওঠে দক্ষিণ মৈশুন্দির নিত্যপ্রবহমান জনজীবনের চলমান প্রতিচ্ছবি, যেখানে ব্যক্তি ও সমষ্টিমানুষের যুগ্ম সন্নিবেশে এতদঞ্চলের প্রাতিস্বিক রূপটি পাঠকের মনোভুবনে সঞ্চার ঘটায় এক ভিন্ন জগতের। পুরনো ঢাকার দক্ষিণ মৈশুন্দির ভূতের গলিতে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতাই লেখককে এতদঞ্চলের মানুষের প্রাত্যহিকতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ অনুষঙ্গসমূহের অনবদ্য সন্নিবেশনায় তাদের জীবনচর্যার শব্দচিত্র নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করেছে।

'কোথায় পাব তারে' গল্পে দক্ষিণ মৈশুন্দির ভূতের গলি মহল্লার অধিবাসীদের দৈনন্দিন দিনযাপনের মন্থরতা ও উদ্যমহীন কালক্ষেপণের চিত্র স্বতন্ত্র মাত্রায় উত্তীর্ণ। তবে এর সমান্তরালে বেকার ও নিষ্ক্রিয় এক ভবঘুরে যুবকের প্রেমভাবনার অন্তর্রহস্য উন্মোচনই উক্ত গল্পের উপজীব্য।[১২] এতদঞ্চলের জনজীবনের বিশেষ প্রবণতা হলো, একের সঙ্গে অন্যের প্রয়োজনহীনতা বা অতি সামান্য প্রয়োজনেও সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহ, যদিও তা নিছকই নিরবলম্ব মুহূর্তগুলোতে অতিক্রমের প্রয়াস। আব্দুল করিম নামক আই.এ পাশ এক বেকার

যুবকের প্রতি মহল্লাবাসীর কৌতূহল ও আগ্রহের অন্তরালে এ প্রবণতাই সক্রিয়। পৈতৃক ব্যবসায় পিতার সঙ্গে দায়িত্বপালনে সে যেমন অনাগ্রহী, তেমনিভাবে তার স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার ব্যাপারে তার পিতা আস্থাহীন ও অসম্মত। একদিন জনৈক বন্ধুর সঙ্গে মহাখালি বাসস্ট্যান্ডে বেড়াতে গিয়ে গ্রামের এক অচেনা তরুণী শেফালি বেগমের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। আকস্মিকভাবে অসুস্থ হওয়ার একপর্যায়ে শেফালিকে তার পরিচর্যার প্রচেষ্টা ও পানি পান করানোর পরবর্তী পর্যায়ে আন্তরিকভাবে বাক্য বিনিময় ও পৈতৃক বৃত্তান্ত সম্পর্কিত অবহিতি করিমকে অভিভূত করে।

> আব্দুল করিম তাকে তার বাহু ধরে নিয়ে এসে একটা কাঠের বেঞ্চে বসায়, হোটেল থেকে পানি এনে খাওয়ায় এবং তখন সে জানতে পারে যে, মেয়েটার নাম, শেফালি; এবং তখন শেফালির সঙ্গে তার অলৌকিক কথাবার্তা হয়। ... সে যখন দেখে বা বুঝতে পারে মেয়েটা একা বাড়ি ফিরছে এবং সে অসুস্থ তার বড় মায়া হয় এবং সে বলে, তুমি একলা যায়া পারবা? আব্দুল করিমের কথা শুনে হয়তো মেয়েটার মজা লাগে, সে বলে, কি কইন, পারতাম না ক্যারে, এল্কা কত্তো গেলাম! তখন, তারপর, বাস না ছাড়া পর্যন্ত তাদের দুজনের মধ্যে আলাপ হয়'। (জহির, ২০০৮ : ১৬-১৭)

হয়ত এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় অন্তর্লোকে সুপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় বলেই তার ঠিকানা নেয়ার পাশাপাশি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে অকপটে শেফালির প্রস্তাব সমর্থনপূর্বক সে ব্যক্ত করে পুনরায় শেফালিকে দেখার অভিলাষ — 'মৈমনসিং যাইনিকা কুনো দিন, যুদি যাইবার কও যামুনে একদিন, দেইখা আমুনে তুমারে' (জহির, ২০০৮ : ১৭)। করিমের এ অভীপ্সা সম্ভবত আব্দুল আজিজ ব্যাপারির মাধ্যমে মহল্লাবাসীর গোচরীভূত হয়। দক্ষিণ মৈশুন্দি থেকে ভূতের গলি, জোড়পুল, পদ্মনিধি লেন, ওয়ারি, বনগ্রাম, নারিন্দা, দয়াগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার মানুষের নিকট করিমের উক্ত পরিকল্পনা সৃষ্টি করে এক অযৌক্তিক অথচ অনস্বীকার্য সংকটের। স্বাভাবিক বিবেচনায় পাঠকের চিন্তায় এ ভাবনার উদ্রেক ঘটতেই পারে, একজন সুস্থ যুবক তার পরিভ্রমণের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নের জন্য ময়মনসিংহ বেড়াতে গেলে এতে সমগ্র মহল্লাবাসীর সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হওয়া কতটা যৌক্তিক। এক্ষেত্রে স্মর্তব্য, পুরনো ঢাকার অধিবাসীদের নিত্যদিনের জীবনভঙ্গি ঢাকা শহরেরই অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে পৃথক। কারণ উক্ত অঞ্চলের জনজীবন অনেক বেশি কোলাহলমুখর এবং ব্যক্তির নিজস্বতায় যতটা আত্মকেন্দ্রিক, বিভিন্ন মানুষের যৌথ অংশগ্রহণে তার চেয়ে অনেক বেশি সামষ্টিকরূপে বহমান। সেখানে ব্যক্তির মনোভঙ্গি ও আচরণ শুধু তারই নিজস্বতার অন্তর্গত নয়, বরং একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গও এতদঞ্চলে সমষ্টিমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে স্বতন্ত্র মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়। লক্ষণীয়, মহল্লাবাসী প্রথম পর্যায়ে করিমের ময়মনসিংহ পরিভ্রমণের বৃত্তান্তকে গুরুত্ব প্রদানে অনাগ্রহী। অতঃপর এ ঘটনায় বাঁক-পরিবর্তন ঘটে পিতৃবন্ধু আব্দুল আজিজের সঙ্গে করিমের কথোপকথনের ঘটনায়। 'ডাইলপুরির মইদ্দে ডাইল নাইকা, হুদা আলু!' (জহির, ২০০৮ : ৯) বলতে বলতেই আকস্মিকভাবে সে তাকে জানায় উক্ত আকাঙ্ক্ষা। ভবঘুরে ও বেকার করিমকে ক্রমাগত জেরার মাধ্যমে সে তার পরিভ্রমণের স্বরূপ আবিষ্কারে সমর্থ হয়। অতঃপর মহল্লাবাসীর কর্মক্লান্তিগত অবসরে সেটিই তাদের জমজমাট আড্ডার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। তবে তা

আরো ব্যাপ্তি পায় আলি আকবরের সঙ্গে তার কথোপকথনের ঘটনায়। ফলে মহল্লাবাসীর ধারণা হয়, তার পিতার ব্যবসার কাজে যুক্ত না হতে এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে এসবই তার কৌশলবিশেষ। অবশেষে বাবুল মিয়া তার সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে এ সম্পর্কে যাবতীয় বৃত্তান্ত উন্মোচনে সক্ষম হয়। 'আইএ পাশ বেকার এবং অলসের রাজা' (জহির, ২০০৮ : ১১)। খামখেয়ালি ও অকর্মণ্য করিমের পক্ষে যে জীবিকার উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ গমন সম্ভব, এমন প্রত্যয়ে স্থিত হতে মহল্লাবাসী অসম্মত। কারণ জন্মের পরবর্তীকালে যে মহল্লার বাইরে কখনো যায়নি, সে হঠাৎ নিছক খেয়ালের বশে ময়মনসিংহ যাবে, এটা ছিল তাদের ধারণারও অগোচরে। তাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়, যখন অন্তত বিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও সে মহল্লাতেই থেকে যায়। অবশেষে ডালপুরির নামে প্রচলিত আলুপুরি খাওয়ানোর ছলে আব্দুল আজিজ করিমের বন্ধুর (শেফালি) পরিচয় উদ্ঘাটনে সমর্থ হয়। অতঃপর শেফালিই হয়ে ওঠে মহল্লাবাসীর আলোচনার বিষয়বস্তু। করিমের মতো বোকাটে, অকর্মণ্য যুবক এক নারীর প্রেমে মত্ত – এমন ভাবনার পরিণতিতে 'মহল্লার লোকদের রাতের ঘুম বিঘ্নিত হয়, সারা দিনের কর্মক্লান্ত দেহ নিয়ে তারা বিছানায় জেগে থাকে, জীবনের ব্যর্থতা এবং অপচয় বোধ তাদের গ্রাস করতে উদ্যত হয় এবং তারা কেমন বিষণ্ন হয়ে পড়ে; তাদের মনে হয় যে, বেকার থাকাইতো ভাল' (জহির, ২০০৮ : ১৫)। করিমের মতো ভবঘুরে ও কর্মহীন যুবকের মাধ্যমে এভাবেই মহল্লাবাসীর সমষ্টিমানসে প্রেমকেন্দ্রিক অবদমিত ঈর্ষাবোধ ও এর সাফল্য-ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।[১৩] আব্দুল আজিজকে সে শেফালির বৃত্তান্ত সম্পর্কে অবগত করায় তার ধারণা হয় – করিম তার অলস জীবনে গতিময়তা সঞ্চারের জন্যই এই কাল্পনিক আখ্যান গড়ে তুলেছে। কিন্তু তার এ ধারণা অচিরেই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, যখন কোনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই করিম তার ছেলে দুলালকে সঙ্গী করে ময়মনসিংহ যেতে রাজি হয়। অন্যদিকে দুলালের নিকট থেকে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানা যাবে ভেবে মহল্লাবাসীর মনোভঙ্গিতেও ফুটে ওঠে সন্তোষ। কিন্তু গন্তব্যস্থলে অগ্রসর হওয়ার একপর্যায়ে তাদের সম্মুখীন হতে হয় অদ্ভুত এক সমস্যার। শেফালির বাড়ির ঠিকানা সম্পর্কে তারা এতটাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যে, এর সমাধান তাদের পক্ষে অসম্ভব বিবেচিত হয়। কারণ করিমকে প্রদত্ত শেফালির ঠিকানা সম্বলিত কাগজটিতে তার পিতা, মাতা বা গ্রামের উল্লেখের পরিবর্তে তার বাড়ি পৌঁছার ক্ষেত্রে পথের বিবরণসূচক অদ্ভুত নির্দেশ ছিল, যা প্রকৃতঅর্থে কোনো তাৎপর্য নির্দেশে অসমর্থ –

ঢাকা মহাখালি বাস স্ট্যান
মৈমনসিং শহর, গাঙ্গিনার পাড়
গাঙ্গিনার পাড়-আকুয়া হয়া ফুলবাইড়া বাজার, থানার সামনে
উল্টা দিকে হাঁটলে বড় এড়াইচ গাছের (কড়ই গাছ) সামনে টিএনউ অপিস
টিএনউ অপিস সামনে রাইখা খাড়াইলে, বাম দিকের রাস্তা-নাক বরাবর
হাই স্কুল ছাড়ায়া বরাবর সুজা, ধান ক্ষেত, কাঁটা গাছ, লাল মাটি,
বামে মোচড় খায়া নদী
আহাইলা/আখাইলা/আখালিয়া নদী
নদী পার হয়া ব্রিজ পিছন দিয়া খাড়াইলে

দুপুর বেলা যেদিকে ছেওয়া পড়ে তার উল্টা দিকে,
ছেওয়া না থাকলে, যেদিকে হাঁটলে পায়ের তলায় আরাম লাগে সেই দিকে
নদীর পাড় বরাবর এক মাইল হাঁটলে দুইটা নাইরকল গাছ
দুই নাইরকল গাছের মইদ্দে খাড়ায়া গ্রামের দিকে তাকাইলে
তিনটা টিনের ঘর দেখা যাইব
তিনটা ঘরের একদম বাম দিকের ঘরের পাশ দিয়া যে রাস্তা গেছে
সেই রাস্তা ধইরা
আগাইলে চাইর দিকে ধান ক্ষেত, পায়ে হাঁটা আইলের রাস্তা
দূরে চাইর দিকে আরো গ্রাম
ক্ষেতে পাকা ধান যেদিকে কাইত হইয়া আছে, সেই দিকে,
অথবা, যুদি ধানের দিন না হয়,
যেদিকে বাতাস বয় সেই দিকে গেলে পাঁচটা বাড়ির ভিটা দেখা যাইব,
তিনটা ভিটা সামনে দুইটা পিছনে,
পিছনের দুইটা বাড়ির ডালিম গাছওয়ালা বাড়ি। (জহির, ২০০৮ : ২০-২১)

আকস্মিকভাবে একদিন শেফালির সঙ্গে সাক্ষাতের পরবর্তী পর্যায়ে করিমের অন্তর্লোকে প্রেমের অনুভব জাগ্রত হলেও তা কতটা প্রগাঢ়, তা উপলব্ধির জন্য তার ময়মনসিংহ গমন আবশ্যক ছিল। তবে শেফালি সম্ভবত চায়নি, আব্দুল করিম পুনরায় তার সঙ্গে দেখা করুক।[১৪] তাই নিছক ভদ্রতার খাতিরেই সে এ বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও তাকে শেফালির হেঁয়ালিপূর্ণ ঠিকানা প্রদানের ঘটনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ময়মনসিংহ যাওয়ার এক পর্যায়ে উক্ত ঠিকানার সঙ্গে পথনির্দেশের অসামঞ্জস্য অনুধাবনপূর্বক সেও এ প্রসঙ্গে সচেতন হয়ে ওঠে। অবশেষে শেফালির গন্তব্যস্থল খুঁজে পেতে ব্যর্থ করিমের বিফল মনোরথে মহল্লায় প্রত্যাবর্তন এবং উক্ত প্রসঙ্গে কোনোরূপ আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ থেকে বিরত থাকায় মহল্লাবাসী এ সম্পর্কে তার মনোভঙ্গি অনুধাবনে সমর্থ হয়। এভাবেই করিমের ইতিবৃত্তকেন্দ্রিক দুর্বার আগ্রহে তাদের ভাটা পড়ে। এরপরও যথারীতি পূর্বের মতোই করিমের আলুপুরিকে ডালপুরি বলে বিক্রির জন্য আব্দুল আজিজের নিকট ক্ষোভ প্রকাশে উপলব্ধি করা যায়, অতীতের দিনযাপনের নিজস্ব ধারাতেই তার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে, যেখানে তার মনোভূমিতে শেফালি অস্তিত্বহীন। অর্থাৎ প্রেমের অনুভব করিমের চিত্তজগতে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুভূত হলেও তা নিছকই ভাবাবেগ। কারণ, প্রেমিকাকে পাওয়ার জন্য প্রেমিকের অটল সংকল্প ও দৃঢ় প্রত্যয় তার অন্তর্লোকে কখনোই জাগ্রত হয়নি। এ গল্পে করিমের মাধ্যমে ব্যক্তিচিত্তে প্রেমানুভবের ক্ষণস্থায়ী রূপটি লেখকের মানব-মনস্তত্ত্ব নিরীক্ষার প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে।

'মহল্লায় বান্দর, আব্দুল হালিমের মা এবং আমরা' গল্পে পুরনো ঢাকার জীবনচিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে লেখক স্পষ্টতই দুটি পৃথক ঘটনাস্রোতকে অবলম্বন করেছেন। প্রথম অংশে ঘটনার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একজোড়া বানর দম্পতি, যাদের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে মহল্লাবাসীর স্বাভাবিক দিনযাপনে ঘটে যায় ছন্দপতন। সেইসূত্রে লেখক অত্যন্ত কৌশলে এতদঞ্চলের মানুষের স্বভাবানুগ প্রবণতাসমূহ উন্মোচনের সুযোগ অবলীলায় গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে উক্ত মহল্লার অধিবাসীদের পরস্পরের

প্রতি সহমর্মিতা ও সহনশীলতা, ঔদার্য ও ত্যাগস্বীকার, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার অনিবার্যতায় প্রিয়জনকে হারানোর মর্মন্তুদ হাহাকার, চরম অনিশ্চয়তাপূর্ণ পরিস্থিতিতে মৃত্যুর ভয়াবহ বিভীষিকা। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের স্মৃতিকে অবলম্বনের প্রচেষ্টায় নিঃসঙ্গ জননীর নীরব আর্তনাদ ও প্রলম্বিত জীবনের দুঃসহ ক্লান্তির মর্মস্পর্শী শিল্পরূপ হিসেবে গল্পটি বিশিষ্ট মাত্রায় উত্তীর্ণ। ভূতের গলিতে আকস্মিকভাবে বানরের প্রাদুর্ভাব মহল্লার বয়োবৃদ্ধদের স্মৃতিভাণ্ডারে দীর্ঘদিন পর সঞ্চার ঘটায় নতুন তরঙ্গাভিঘাত। স্বাভাবিকভাবেই বানরের উপস্থিতি তাদের নিকট বিরক্তিকর। কারণ, চৌর্যবৃত্তিতে এরা বেশ তৎপর। কোনো বাড়ির রান্নাঘর থেকে হরলিক্সের কৌটা চুরির পরবর্তী পর্যায়ে মহল্লার শিশুদের বানরের পশ্চাদ্ধাবন ও জিভ বের করে ভেংচি ও ছড়া কাটা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তবে একপর্যায়ে বানরের অনুপস্থিতি সম্পর্কে মহল্লাবাসী সচেতন হলেও পুনরায় দীর্ঘদিনের ব্যবধানে তাদের আবির্ভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের বিভ্রান্তির সঞ্চার ঘটায়। তাই আকস্মিকভাবে একদিন কোনো পরিবারে কোনো বস্তুর অনুপস্থিতি স্বাভাবিক বিবেচনায় চুরি হিসেবে প্রতিভাত হলেও সেই পরিবারের সদস্যদের মনোভঙ্গিতে বিস্তৃত হয় অবিশ্বাস ও বিস্ময়বোধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নুরুল হকের জন্য তার স্ত্রী রুনুর মধ্যাহ্নে ভাত রান্নার এক পর্যায়ে তা চুরি হওয়ায় উপর্যুক্ত সত্যের প্রতিফলন লক্ষণীয়। ভাতসহ হাড়ি অদৃশ্য হওয়ার ঘটনা তাদের নিকট বিবেচিত হয় ভৌতিক ঘটনারূপে। অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই এ ঘটনাকে কোনো ভিখারিণীর চৌর্যবৃত্তি হিসেবে বিবেচনাপূর্বক রুনুকে হতে হয় তিরস্কৃত; অবশেষে পুনরায় স্বামীর জন্য রান্নার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। ঘটনাটি মহল্লায় প্রচারিত হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে আব্দুর রহিমের মূল্যবান হাতঘড়ি হারানোর ফলে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের তীর নিক্ষিপ্ত হয় তরুণ গৃহভৃত্য আকবর ও বৃদ্ধ পরিচারিকা বাসনার মায়ের ওপর। যদিও চুরির সপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবুও নিছক সন্দেহের বশেই 'বাসনার মাকে ছোটখাটো চড়থাপ্পড় লাগানো এবং আকবরকে চাকুরিচ্যুত করার গুরুতর হুমকি' (জহির, ২০০৮ : ৪৪) সত্ত্বেও তেমন কোনো সাফল্য এক্ষেত্রে অর্জিত হয় না। অবশেষে একদিন বাসনার মা আব্দুর রহিমের স্ত্রী পারভীনের প্রহারের প্রতিক্রিয়ায় তীব্র আক্ষেপবশত অভিশাপ প্রদান করায় মহল্লাবাসী নিজেদেরই সীমাবদ্ধতা স্বীকারে বাধ্য হয়। 'মহল্লার লোকেরা বলে যে, তারা আসলে বোকা ছিল, তাদের এই বোকামির কারণ, তারা মহল্লায় বহুদিন বানর দেখে নাই, এবং বানরের কথা ভুলে যাওয়ার ফলে তাদের জীবনে এই বিভ্রান্তি আসে' (জহির, ২০০৮ : ৪৫)। বানরদের চৌর্যবৃত্তিতে মহল্লাবাসীর মনোজগতে সৃষ্ট বিরক্তিবোধের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে পূর্বোক্ত ঘটনাদ্বয়ের পুনরাবৃত্তিতে। আলি রেজা ব্যাপারির বাড়িতে বানরের হরলিক্সের কৌটা চুরির ঘটনায় তারা নিশ্চিন্ত হয়, মহল্লায় পুনরায় বানরের আবির্ভাব ঘটেছে, যদিও তাদের সাক্ষাৎ প্রাপ্তি দুষ্কর। অবশেষে তাদের অনুমান সঠিক প্রমাণিত হয় চন্দ্রকান্তের ভাই চন্দ্রশিবের ঘুড়ি ওড়ানোর সময় পাশের বাড়ির ছাদে রুনুর ভাতের হাড়ি আবিষ্কারের ঘটনায়। এভাবেই মহল্লাবাসীর বানর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা যখন প্রবল, তখন আকস্মিকভাবেই লজেন্স কারখানার শ্রমিকরা উক্ত বানর দম্পতিকে অবলোকনে সমর্থ হয়। কিছুদিন পর —

> মহল্লার লোকেরা নিশ্চিত হয় যে, ভূতের গলিতে তারা বিভিন্ন জায়গায়, ছাতে, দেয়ালের ওপর অথবা কোনো কার্নিশে যে দুটি বানরকে দেখে, সেগুলো আসলে একই বানর, এবং তারা আরো নিশ্চিত হয় যে, বানর দুটির একটা, যেটা আকারে বড়, সেটা মর্দা বানর, অন্যটা মাদি। তখন ভূতের গলিতে বান্দর নিয়ে সব ঘটনা ঘটতে থাকে, এবং মহল্লার লোকেরা বিহারির দোকানে বসে আলুপুরি এবং চা খায় আর বানরের গল্প করে। ...তারা বলে, এই বান্দর দুইটা থাকে কই, গাছে, না কুনো বাড়ির ছাদে? তাদের কাছে এই বিষয়টিও অনেক দিন ধরে রহস্য হয়ে থাকে; বানর দুটো, একটার পিছনে অন্যটা, দেয়ালের ওপর দিয়ে হেলেদুলে হেঁটে যায়, কোন এক বাড়ির ছাতের ওপর থেকে অন্য বাড়ির ছাতের ওপর লাফিয়ে পড়ে অথবা দুপুর বেলা কোন কার্নিশের ওপর লেজ ঝুলিয়ে শুয়ে থাকে। মহল্লার নারী পুরুষ, শিশু কিশোর এবং বৃদ্ধ, সকলে, যখন যার হাতে সময় থাকে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বানর দেখে, বানরের সব কিছুই তাদের কাছে খেলা মনে হয়; কিন্তু তারা এই বানরের আস্তানার হদিস জানতে পারে না। (জহির, ২০০৮ : ৫১)

তাদের দৈনন্দিন জীবনে বানর ক্রমশই হয়ে ওঠে কৌতূহল ও আড্ডার বিষয়বস্তু। কেননা ইতঃপূর্বে হারানো হাতঘড়ির সন্ধান পাওয়ার পর যখন অভিযুক্ত ভৃত্য আকবর স্বাভাবিকভাবেই আব্দুর রহিমের অভিযোগের প্রত্যুত্তরে বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, তাকে পুনরায় হতে হয় চরমভাবে নিগৃহীত। এরই ধারাবাহিকতায় বানরদের শায়েস্তা করার অভিপ্রায়ে সে যখন লাঠি নিয়ে তাদের অনুসন্ধানে অগ্রসরমান, তখন আকস্মিকভাবে তাকেই বরং বানরদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। পুরুষ বানরটি তার পশ্চাদ্দেশে দংশনে ব্যর্থ হলেও এ ঘটনা প্রকাশিত হওয়ায় সে মহল্লাবাসীর পরিহাসের পাত্রে পরিণত হয়। পুরনো ঢাকার অধিবাসীদের জীবনাচরণের স্বাতন্ত্র্যই এ ঘটনায় উন্মোচিত হয়। কারণ প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে যাওয়া আপাততুচ্ছ ঘটনাও তাদের চিত্তবিনোদন ও মনোরঞ্জনের উৎস। এছাড়াও তাদের রসিকতার ধরনটিতে এতদঞ্চলের মানুষের কথোপকথনে হরহামেশাই উচ্চারিত অপভাষা, গালিগালাজ ও অশ্লীল ইঙ্গিতের সহজাত সন্নিবেশ ঘটে।

> মহল্লার লোকেরা ... আকবরকে বিরক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বলে, হাচাই তর হোগায় কুনো ক্ষতি হয় নাইকা, ভালা কইরা দেখ কামুড় লাগছে নিহি, বাসনার মায়েরে দিয়া দেখা! ... অই আকবর, অই হালারপোত এদিকে আয়, ... তরে বান্দরে কামড়াইছে, নিজে নিজে মাদবরি না কইরা ডাক্তারের কাছে যা, যায়া হোগা দেখায়া সুই ল গা, না হইলে তুই মরবি, (জহির, ২০০৮ : ৫৩-৫৪)

বানর-সম্পর্কিত বৃত্তান্ত মহল্লাবাসীর নিকট পূর্ণতা পায় যখন ঘটনাক্রমে তাদের নিকট দেখা যায় একটি পিস্তল। এর দুদিন পর বানরদের কৌতূহলের পরিসমাপ্তিবশত সেটি পরিত্যাগ এবং পুলিশের আবির্ভাব, তাদের জেরা এড়িয়ে যেতে ভূতের গলির বাসিন্দাদের তৎপরতা; অতঃপর পুনরায় আকবরকে দর্শনমাত্র পূর্বের ন্যায় রঙ্গ-ব্যঙ্গের ঘটনায় তাদের দৈনন্দিন চালচিত্রের সার্বিক রূপরেখার ধরনটি আভাসিত হয়। জৈবিক প্রবৃত্তিগত আবেগের দুরন্ত বহিঃপ্রকাশের তাড়নায় বানর দম্পতির বিচিত্র কর্মকাণ্ড এভাবেই ভূতের গলির বাসিন্দাদের মনোজগতেও উদ্ভব ঘটায় বৈচিত্র্যপূর্ণ সংবেদনারাশির, যেখানে জীবনের অবারিত আহবানে তাদের প্রাত্যহিকতায় বানরেরাও হয়ে ওঠে একান্ত সহচর।

এ গল্পে পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের দুর্যোগপূর্ণ আবহে পুরনো ঢাকার অধিবাসীদের বিপর্যস্ত ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সামগ্রিক রূপরেখার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান এক তরুণ মুক্তিযোদ্ধার, যার অপ্রত্যাশিত ও বেদনাদায়ক মৃত্যু ভূতের গলির মহল্লাবাসীকে পরবর্তীকালেও বারবার স্মরণ করায় পাকবাহিনীর নির্মম তাণ্ডবের ভয়াবহতায় তাদের জীবনের চরম সংকটময় মুহূর্তগুলোকে। সেইসঙ্গে সন্তানহারা জননীর করুণ বিলাপ ও হাহাকারের সুরে তাদের চেতনালোকে প্রিয়জনকে হারানোর মর্মন্তুদ যন্ত্রণার অন্তরালে স্বাধিকার অর্জনের বজ্রকঠিন অভিলাষ বারবার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। উনিশশ একাত্তর সালের মার্চের প্রথমদিকেই সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা। ফলে অচিরেই পাক হানাদারদের সামরিক হামলার সম্মুখীন হয় ঢাকা শহর। রাতে কার্ফু জারিকৃত অবস্থায় নয়াবাজারের কাঠের গোলায় অগ্নিসংযোগ ও টিপু সুলতান রোডে ছুটে যাওয়া ভারি মিলিটারি গাড়ির চাকার গোঙানিতে পুরনো ঢাকা হারায় জনজীবনের স্বাভাবিক স্পন্দন। সেই বিপন্ন পরিস্থিতিতে উক্ত মহল্লাবাসীর সংকট ঘনীভূত হয় হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিমের সশস্ত্র সংগ্রামের পরিণতিতে মৃত্যুবরণের প্রতিক্রিয়ায় তার মায়ের বিলাপের ঘটনায়। অতঃপর সময়ের পরিক্রমায় অতিক্রান্ত হয় বহু বছর; তবুও মহল্লাবাসীর মনোভূমিতে আব্দুল হালিমের ভাস্বর অবস্থান অটুট থাকে। পরিণামে সে হয়ে ওঠে মহল্লাবাসীর গর্ব ও আত্মত্যাগের অনবদ্য দৃষ্টান্ত। পঁচিশে মার্চের কালোরাতের নির্মম হত্যাযজ্ঞে যখন বিপন্ন মানুষের করুণ আর্তনাদ ও প্রাণ বাঁচানোর অসহায় প্রচেষ্টা সামরিক বাহিনীর বন্দুক ও মেশিনগানের অগ্নিস্রোতের নিকট পরাজিত হয়, তখন এর প্রতিকারে ভূতের গলির অধিবাসীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কারণ এ দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে তারা যেমন বিভ্রান্ত, তেমনিভাবে প্রতিকূলতা অতিক্রমের অভিপ্রায়ে যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণেও তারা ছিল দ্বিধান্বিত। এ পর্যায়ে তারা সর্বাগ্রে শরণাপন্ন হয় আব্দুল হালিমের। কেননা সে ইতোমধ্যেই সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে যুদ্ধের সশস্ত্র প্রশিক্ষণে যোগদানপূর্বক পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদী অবস্থানকে সুচিহ্নিত করতে সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল। পরদিন ভোরে আজানের ধ্বনিতে মহল্লাবাসীর ঘুম না ভাঙার অন্তরালেও রয়েছে তাদের সন্ত্রস্ত মানসিকতার সমান্তরালে উপর্যুক্ত নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে পাক হানাদারদের রোষানল উপেক্ষা করার সচেতন প্রচেষ্টা। সেকারণেই মহল্লার মসজিদের মুয়াজ্জিন মাইকে আযান প্রচারে বিরত থাকে — 'মাওলানা নূরুজ্জামানের চেহারা বিষণ্ন হয়ে ওঠে, সে বলে যে, আসলে তারও ভয় হয়েছিল, কারণ সেও মানুষই, তার মনে হয়েছিল যে, উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ এই জন্তুদের সামনে নীরবতা হয়তো মঙ্গলকর হবে' (জহির, ২০০৮ : ৪২)। উক্ত সংকটাপন্ন পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পেতে কার্ফুর আদেশ এড়িয়ে বুড়িগঙ্গা অতিক্রমপূর্বক জিঞ্জিরা [১৫] ও নবাবগঞ্জে প্রস্থান ব্যতীত তাদের গত্যন্তর ছিল না। এ পর্যায়ে প্রতিবেশী আবু হায়দারের উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী কন্যা দশম শ্রেণির ছাত্রী হাসিনা আকতার ঝর্ণার প্রতি আব্দুল হালিমের প্রেমসিক্ত ভালোলাগার স্ফুরণ ঘটে চরাইলে তার খালার বাড়িতে উভয় পরিবারের আশ্রয় গ্রহণের ঘটনায়। আব্দুল হালিম কর্তৃক ঝর্ণার মাকে জিঞ্জিরায় গমনের প্রস্তাব দানের অন্তরালে সংগুপ্ত ছিল ঝর্ণার প্রতি আব্দুল হালিমের প্রেমবিমুগ্ধতার সম্মোহন।

> আব্দুল হালিম দেখে ... মায়ের সঙ্গে কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলের পাটকেল রঙের মলিন কামিজ পরা মেয়েটি বিকেলের ঘনিয়ে আসা ছায়ার ভিতর তাদের কামিনি গাছতলা দিয়ে কেমন কেঁপে কেঁপে হেঁটে আসে। তখন আব্দুল হালিম ছায়ায় জড়ান ঝর্ণার ভীত মুখ এবং চোখের দিকে তাকায়, এবং তার মনে হয় যে, মহল্লার এই মেয়েটিকে সে কি আগে কখন দেখে নাই! ...আব্দুল হালিমের মনে হয়েছিল, সে জানে সে ঝর্ণাদেরকে তাদের সঙ্গে জিঞ্জিরা যেতে বলবে। (জহির, ২০০৮ : ৪৪)

চরাইল গ্রামে পৌঁছার পূর্বেই ঝর্ণাকে পাকবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হতে হয়। তবে এ পর্যায়ে নিজের সম্ভ্রম ও প্রাণ বিসর্জনের বিনিময়ে সে আব্দুল হালিমকে তাদের কবল থেকে রক্ষায় সমর্থ হয়। অতঃপর প্রেমিকাকে হারিয়ে মর্মন্তুদ বেদনায় অভিভূত আব্দুল হালিমকে বাস্তবতার দুর্লঙ্ঘ্য আহবানেই প্রত্যাবর্তন করতে হয় মহল্লায়। কারণ, স্বাধীনতার যুদ্ধে তার ভূমিকা নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধার, যে শত্রুকবলিত দেশকে স্বাধীন করতে প্রাণের মায়া, প্রেমিকের ভালোবাসাকে অতিক্রমপূর্বক কঠোর সংকল্পে অগ্রসরমান। ঘটনাক্রমে, এক রাতে আবু হায়দারের বাড়িতে রাত্রিযাপনকালে সে ঝর্ণার চুল বাঁধার লাল সার্টিনের একটি ফিতা পায়, যা তার চেতনালোকে প্রতিভাত হয় প্রেমিকাকে হারানোর অন্তর্যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের প্রতীকরূপে। জিঞ্জিরা থেকে মহল্লার অধিবাসীদের প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে তাদের মনোভূমিতে বিস্তৃত হয় নিরাপত্তাহীনতাজাত চরম উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। ক্রমশই মহল্লায় মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতাজনিত ঘটনাসমূহ প্রচারিত হয়, যা আব্দুল হালিমকে অনুপ্রাণিত করে। তাই এক বর্ষণমুখর রাতে নিরুদ্দেশযাত্রার পূর্বে সে তার মায়ের নিকট চিরকুটে বিষয়টি জানাতে আগ্রহী হয়। ফলে মহল্লাবাসীর মনে এ আশাবাদের সঞ্চার ঘটে, হয়ত সে রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইরত। তবে দুই মাসের ব্যবধানে তার মৃত্যুসংবাদ বহনকারী জনৈক যুবকের মারফত মহল্লাবাসী জানতে পারে, কামরাঙ্গির চরের অভ্যন্তরবর্তী বুড়িগঙ্গার কূলে অপেক্ষমান নৌকায় উঠতে গিয়ে পা পিছলে নদীগর্ভে তার সলিল সমাধি ঘটে। একদিন আকস্মিকভাবেই কাগজে মোড়ানো লাল ফিতাটি পাওয়ার ফলে তার মা অনুধাবনে সক্ষম হয় ঝর্ণার প্রতি আব্দুল হালিমের ভালোবাসার প্রসঙ্গটি। তাই তার প্রত্যাবর্তনের প্রহর গণনায় ক্লান্ত আমেনা বেগমের বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে ছেলের প্রতি অগাধ বাৎসল্যের স্রোত পুনঃপুন প্রবাহিত হয় —

> এই ফিতার দিকে তাকিয়ে আমেনা বেগমের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়, হয়তো মৃত বালিকা ঝর্ণার জন্য, হয়তো তার পাগল ছেলের জন্য। তারপর, সেদিন সে ফিতাটা একই কাগজে জড়ানো অবস্থায় তার বেতের ব্যক্তিগত তোরঙ্গের ভেতর সংরক্ষণ করে রেখে দেয় এই আশায় যে, একদিন আব্দুল হালিম যখন মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরবে তখন সে বুঝতে পারার আগেই আমেনা বেগম ফিতাটা ঠিক আগের জায়গায় রেখে দেবে; এবং তখন আব্দুল হালিমের যখন ফিতাটার কথা মনে পরবে সে বিছানায় তোশক উল্টে দেখতে পাবে যে, আরে আশ্চর্য, ফিতাটা একই অবস্থায় রয়ে গেছে এবং তখন তার ঝর্ণার কথা মনে হবে এবং চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসবে। মৃত ঝর্ণার কথা ভেবে ছেলের চোখের পানি দেখা দেয়ার সম্ভাবনায় তখন আমেনা বেগমের চোখ আদ্র হয়ে ওঠে; সে তোরঙ্গের ভেতর ফিতাটা রেখে দিয়ে দিন গনে। (জহির, ২০০৮ : ৫২)

অবশেষে তার অপেক্ষার পালা সাঙ্গ হয় ছেলের আবির্ভাবের পরিবর্তে তার মৃত্যুর সংবাদ শোনার মাধ্যমে। অতঃপর ঝর্ণার লাল ফিতাটি তার অশান্ত চিত্তে হয়ে ওঠে প্রিয়তম পুত্র ও তার দয়িতাকে হারানোর মহার্ঘ্য স্মারক। সময়ের প্রবাহে যখন তার চেতনালোকে সেই লাল ফিতা বেদনার পরিবর্তে মাতৃহৃদয়ের কোমল প্রশান্তির স্মৃতিচিহ্ন হয়ে ওঠে, তখন ঝাড়ুদারনি নিমফল দাসীর বালিকা কন্যা আলতাজবার চুলে সেই এর গ্রন্থির মাধ্যমে আমেনা বেগমের অশান্ত চিত্তে প্রিয়জন হারানোর পরিতাপ পরিস্ফুট হয়। আমেনার বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে বার্ধক্যের ক্লান্তি ও সন্তান হারানোর প্রবল বেদনার অবসানের পরিবর্তে 'জীবন হয়তো নিঃশেষ হয়ে আসে, হয়তো শীতের পূর্বেকার অশথের পাতার মত বিবর্ণ হয়ে ওঠে এবং ঝরে পড়ার প্রান্তে উপনীত হয়ে হিমেল হাওয়ায় ঝিরঝির করে কাঁপে' (জহির, ২০০৮ : ৫৫)। ব্যক্তিক অনুভবের সমান্তরালে সমষ্টিমানুষের বিচিত্র কলরোলে মুখরিত ভূতের গলির বাসিন্দাদের বৃত্তান্ত উপস্থাপনে এ গল্পে লেখকের অসামান্যতা এভাবেই পাঠকের অভিজ্ঞতায় নতুন সংবেদনার অনুরণন ঘটায়।

'ইন্দুর-বিলাই খেলা' গল্পে লেখক অত্যন্ত কুশলী ভঙ্গিতে পুরনো ঢাকার জনজীবনে ক্রমবিস্তৃত সামাজিক অবক্ষয়, নৈরাজ্যবাদ, দুর্বলের ওপর সবলের আক্রমণ, নারী নির্যাতন, স্বাধীন দেশেও সংখ্যাগুরুর আধিপত্যপ্রবণ আচরণের চাপে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিপন্নতাজাত সংকট প্রভৃতি বিষয়ের উপস্থাপনে বিশিষ্টতার দাবিদার। এ গল্পের আধার ও আধেয়ের সহায়ক হিসেবে তিনি নির্বাচন করেছেন একাধিক রেখাচিত্র ও সুনির্দিষ্ট শিরোনাম। এর ফলে নির্দিষ্ট ঘটনার তাৎপর্য পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে উক্ত কালপর্বের সমাজ-জীবনের পরিপূর্ণ প্রতিবিম্ব অনুধাবনে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে। গল্পের নামকরণ প্রসঙ্গও এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যেখানে ইঁদুর ও বিড়াল হয়ে ওঠে যথাক্রমে খাদ্য ও খাদকের, শোষিত ও শোষকের, উৎপীড়িত ও উৎপীড়কের, ক্ষমতাহীন ও ক্ষমতাবানের বিপ্রতীপ অবস্থানের প্রতীক। উক্ত গল্পের ভাষ্য অনুযায়ী, মুক্তিযুদ্ধের দুর্যোগময় সময়ে ভূতের গলিতে 'ইন্দুর-বিলাই' খেলা অর্থাৎ অন্যের ওপর জোর-জবরদস্তি ও আধিপত্য বিস্তারের সুত্রপাত ঘটে। মহল্লায় পাক হানাদার ও তাদের দোসর রাজাকারদের আনাগোনা এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দক্ষিণ মৈশুন্দির শান্তি কমিটির সদস্য মওলানা আব্দুল গফুরের নির্দেশে এতদঞ্চলের রাজাকারদের কমান্ডার আব্দুল গনি ও তার সঙ্গীরা মহল্লার তরুণ-যুবকদের ক্লাব ও সঙ্ঘের আস্তানা দখলপূর্বক জনমনে ত্রাসের সঞ্চার ঘটাতে সমর্থ হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জনৈক মহল্লাবাসী আব্দুল করিমের সঙ্গে কথোপকথনে উন্মোচিত হয় রাজাকারদের বিক্ষুব্ধ মানসিকতার স্বরূপ। মুসলিম লীগের পরিবর্তে আওয়ামী লীগকে ভোটদান ও রাজনৈতিকভাবে সমর্থন, এমনকি হিন্দু অধিবাসীদেরও আওয়ামী লীগের প্রতি পক্ষপাত প্রভৃতি ঘটনাই রাজাকারদের উদ্বুদ্ধ করে ভূতের গলির বাসিন্দাদের নিপীড়নে। ৩০ মে রবিবার সকালে উক্ত মহল্লায় পাকিস্তানি হানাদাররা রাজাকার বাহিনীর প্ররোচনায় উপস্থিত হয়। তাদের অপতৎপরতায় ভীত, সন্ত্রস্ত অধিবাসীরা প্রাণের ভয়ে বাড়ির পশ্চাদ্বর্তী দরজা দিয়ে আত্মগোপনে সচেষ্ট হলে 'পাকিস্তানি মিলিটারি দলের নেতা লেফটেনান্ট শরিফ ক্ষেপে, ... আব্দুল গনি বলে, হালারা চুহা (ইঁদুর) হায়। ... তারপর ভূতের গলি ছেড়ে যাওয়ার সময় লেফটেনান্ট শরিফ বলে,

হামলোগভি বিল্লি (বিড়াল) হায়, হাম ফির আয়েঙ্গে' (জহির, ২০০৮ : ৬৩)। প্রাণের দায়ে মহল্লাবাসী একসময় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেও কিছুদিনের মধ্যেই অনুরূপ পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ায় তাদের একাধিকবার আত্মগোপনে বাধ্য হতে হয়। তবে প্রাণে রক্ষা পেলেও এ পর্যায়ে তাদের বসত-ভিটা অগ্নিসংযোগের কারণে ভস্মীভূত হয়। এক্ষেত্রে খতিজার বাড়িটি সেই দুর্যোগকালে রক্ষা পেলেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বদিন সেটি গতানুগতিক পরিণতির সম্মুখীন হয়। অতঃপর মুক্তিযোদ্ধারা মহল্লায় প্রত্যাবর্তনের একপর্যায়ে তাদের অগ্নিসংযোগের ফলে রাজাকার মওলানা আব্দুল গফুরের বাড়িটিও একই পরিণতি লাভ করে। এ পর্যায়ে সে হয়ে ওঠে ইঁদুরের প্রতীক। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতাকারী ও পাকিস্তানের সমর্থক রাজাকারদের সাধারণভাবে ক্ষমা করার ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর পুনরায় তার আবির্ভাব ঘটে মহল্লায়। মহল্লাবাসী উক্ত খেলা বিস্মৃত হতে চাইলেও তাদের যৌথ অবচেতনায় অবক্ষয় ও বিনষ্টির প্রতীকে পরবর্তীকালে সেটি বিস্তৃত হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন সংকটাপন্ন সময়ে বাঙালি নারীর ওপর পাক হানাদার ও রাজাকার নরপিশাচদের কদর্য লোলুপতা, বুভুক্ষু মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ গল্পে পল্লবিত হয়েছে আব্দুল কাদেরের বিধবা বড় বোন খতিজা বেগমকে কেন্দ্র করে। ভূতের গলিতে আব্দুল গনির আবির্ভাবলগ্নেই খতিজাকে লেফটেনান্ট শরিফ ও তার সঙ্গী সিপাহীদের কামানলে আত্মাহুতি দিতে হয়। তবু তার আত্মবিসর্জনের পরিসমাপ্তি ঘটে না। বরং এ ঘটনাকে ভিত্তি করে আব্দুল গনি তাকে রীতিমতো হুমকি প্রদান করে — যদি খতিজা তাকে দৈহিকভাবে পরিতুষ্ট করতে অসম্মতি জানায়, তবে সে মহল্লায় তার ধর্ষণের ঘটনা প্রচার করবে। এরূপ বিপন্ন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই খতিজার পরিবার আব্দুল গনির প্রস্তাব মেনে নিয়ে তার তিনবেলা আহারের বন্দোবস্তের মাধ্যমে সমগ্র বিষয়টি গোপন করতে সচেষ্ট হলেও অবশেষে প্রকৃত ঘটনা মহল্লাবাসীর সতর্ক দৃষ্টিপাতে ধরা পড়ে। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় খতিজার আত্মসংকট ও সম্ভ্রমহানিজনিত প্রবঞ্চিত মানসিকতার স্বরূপ —

> মেয়েটা হয়তো খুব বোকা ছিল, গুছিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা হয়তো ছিল না, হয়তো লজ্জা আর ভয়ে সব গুলিয়ে ফেলেছিল সে; আব্দুল গনির কাছে ধরা দেয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল তার বাপের বাড়িটা রক্ষা করা, কিন্তু পরিণতিতে বাড়ি এবং ইজ্জত দুইটাই যায়। সে তার একবার খোয়ানো সম্ভ্রম আব্দুল গনির কাছে পুনরায় খোয়ায়, তারপর দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েকদিন আগে যখন মহল্লার মানুষের চোখের সামনে তাদের বাড়িটা পোড়ে, তখন লোকেরা প্রথমে ভাবে যে, রাজাকার আব্দুল গনি ভেগে যাওয়ার আগে হয়তো বাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু পরে মহল্লার লোকেরা বলে যে, আসলে এই সময় খতিজার হয়তো অন্য এক ধরনের অনুভূতি হয়, তার হয়তো মনে হয় যে, পোড়া মহল্লার ভেতর একটা বাড়ি অক্ষত থাকাটা অশ্লীল, হয়তো এ কারণে তার লজ্জা হয় এবং সে তার বাপের বাড়িটা আগুন লাগিয়ে পোড়ায়। (জহির, ২০০৮ : ৬৭)

যে আবাসকে পাক হানাদার ও তার দোসর রাজাকারদের কবল থেকে রক্ষার বিনিময়ে খতিজা হারিয়েছিল নারীত্বের শুচিতা ও সম্মান, অবশেষে নিজ হাতে সেই পাপালয়ে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে সে যেন তার চেতনালোকে পুঞ্জীভূত ক্লেদ ও গ্লানির শৃঙ্খল থেকে এভাবেই নিষ্কৃতি অর্জনে সমর্থ হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা আব্দুল গনির নিধনের ঘটনায় মহল্লাবাসী আপাতঅর্থে সান্ত্বনা পেলেও 'ইন্দুর-বিলাই

খেলা'র নবতর সংস্করণ তাদেরকে অচিরেই নতুন সংকটের দিকে ধাবিত করে। এর প্রেক্ষাপটে রয়েছে স্বাধীনতা-উত্তরকালীন সময়ে রাজনৈতিক মতাদর্শগত দৈন্য ও সামাজিক সংকটের অবক্ষয়িত রূপের সমন্বয়।

> ২য় সহস্রাব্দের শেষ দুই দশকে এই দেশের রাজনীতি এক বিশেষ মোড় এবং এর অনুষঙ্গ হিসাবে মহল্লার লোকদের চোখের সামনে উত্থান হয় হুমু জাহুদের; হুমু হচ্ছে মোঃ হুমায়ুন কবির এবং জাহু হচ্ছে মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, তারা মসজিদের পিছনের গলির আব্দুর রাজ্জাক ব্যাপারির ম্যাট্রিক পাশ কিন্তু আইএ ফেল দুই ছেলে। আই এ বা এইচএসসি ফেল করার পর তারা টুকিটাকি বদমায়েশি করে হাত পাকায়, তারপর মহল্লার যুবনেতা ইব্রাহিম খানের সঙ্গে চলাফেরা করতে করতে দ্রুত ছিঁচকে থেকে ধাড়ি হয়ে ওঠে। ... কিছু বুঝে ওঠার আগেই, তারা ভূতের গলিতে ইন্দুর-বিলাই খেলার এক নতুন নিয়ম চালু করে ... হুমু এবং জাহু ইন্দুর-বিলাইয়ের এক বিধ্বংসী সংস্করণ মহল্লায় চালু করে: ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কেরানি আলতাফ আলিকে দিয়ে খেলাটা শুরু হয় এবং মহল্লার লোকেরা তা জানতে পারে। (জহির, ২০০৮ : ৬৮)

অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গী হিসেবে মহল্লার বখাটে মাস্তানদের পেশীশক্তি ও অস্ত্রের চর্চা জনমনে ত্রাসের সঞ্চার ঘটায়। ইব্রাহিমের প্রত্যক্ষ মদদ ও সহায়তায় অতিদ্রুতই দুই ভাই ছিঁচকে চুরি থেকে মানুষ হত্যা প্রভৃতি অপকর্ম সংঘটনের মাধ্যমে ইঁদুর থেকে বিড়ালে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর সাধারণ একজন কেরানিকে দুই ভাইয়ের হুমকি প্রদানের ঘটনা মহল্লাবাসীর নিকট দুর্বোধ্য প্রহেলিকা বলে বিবেচিত হয়। কারণ আলতাফ আলির মতো গোবেচারা স্বভাবের ব্যক্তিকে মস্তানদের প্রতিপক্ষ হিসেবে মেনে নিতে তারা অসম্মত। মোড়ের চায়ের দোকানে তাদের বিকেল বা সান্ধ্য আড্ডায় প্রথমে বিষয়টি একান্ত রসিকতা হিসেবেই আলোচিত হলেও অচিরেই ঘটনাটির ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ ঘটে যখন 'দক্ষিণ মৈশুন্দির গলির ম্যানহোলের ভেতর থেকে চাক্কুর ঘাইয়ে পেট চিরে উন্মুক্ত করে ফেলা তার (আলতাফ আলি) লাশ আবিষ্কৃত হয়' (জহির, ২০০৮ : ৭০)। হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে দুই ভাইকে গ্রেপ্তারপূর্বক কোর্টে চালানের দুই দিন পর পুনরায় মহল্লায় তাদের সদর্পে প্রত্যাবর্তনের পরিণতি হলো প্রাণের ভয়ে আলতাফ আলির স্ত্রী সুপিয়ার দুই সন্তানসহ বিড়ালরূপী হুমু ও জাহুর ভয়ে 'লৌড়ালৌড়ি'; যেহেতু সে হত্যা মামলার বাদি। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, মহল্লাবাসী দুই সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদের প্রচেষ্টা চালায়নি; যদিও "মহল্লা এবং দেশে বিপর্যয় ও পতনের ভেতর তারা বিহারির চায়ের দোকানে অবসরে বসে চা আর নিমকপারা খায়, গল্প করে, অদৃশ্য কাউকে 'মান্দার পোলা' অথবা 'নাটকির পোলা' বলে গাল দিয়ে হাসে। কিন্তু তারা দেখে যে, ভেগে যাওয়ার কোনো উপায় নাই, তারা ক্রমশ আক্রান্ত হয়" (জহির, ২০০৮ : ৭১)। সামাজিক অবক্ষয়ের অবাধ বিস্তৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি আস্থাহীনতাই যে মানুষকে অপরাধের দিকে ধাবিত করে। তাই এ বৈরী পরিস্থিতিতে সকলেই নিজের নিরাপত্তা অটুট রাখতে শত অন্যায়ের প্রতিবাদেও নীরব থেকে পরোক্ষভাবে সেই অন্যায়কেই সমর্থন জানায়, যার রূঢ় শিল্পভাষ্য উপর্যুক্ত ঘটনাংশ। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মহল্লায় দুই সন্ত্রাসী ভাইয়ের অপতৎপরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তবে হুমু ও জাহুর 'ইন্দুর-বিলাই খেলা'র আয়োজন পরবর্তী পর্যায়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, যখন তারা এতিম কিশোর মোহাম্মদ সেলিমকে ইঁদুর ঘোষণা করে। এক্ষেত্রে খতিজা বেগমের উপস্থিতি ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকায়

সমাজে নারী সম্পর্কে মহল্লাবাসীর গতানুগতিক ধারণা পুনর্বিবেচনার সুযোগ ঘটে। সমষ্টিগতভাবে যে সমস্যার সমাধানে তারা নির্জীব ও অক্ষম, খতিজার একক ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে। মুক্তিযুদ্ধকালীন বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাকে মোকাবেলার সুদৃঢ় মানসিকতাই খতিজাকে উদ্বুদ্ধ করে হুমু ও জাহুর অপতৎপরতার প্রতিকারে। জাতীয় জীবনের বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে যখন জনগণ উদ্ভ্রান্ত, তখনই আবির্ভাব ঘটে তথাকথিত বিড়াল বা সন্ত্রাসীদের। অথচ এর প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন মহল্লাবাসীর সমন্বিত উদ্যোগ, যদিও তা ভূতের গলির ভীত, পলায়নপর ও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট বাসিন্দাদের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে না। তবে এক্ষেত্রে তাদের বোধোদয় ঘটে খতিজার ভূমিকা অবলোকনের ঘটনায়। মোহাম্মদ সেলিমের বৃদ্ধ দাদি হুমু ও জাহুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনার বিনিময়ে চরম অপমান ও ভর্ৎসনার শিকার হয়। তাকে আসন্ন সংকট থেকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে মহল্লাবাসীর সচেতন দূরত্ব রক্ষার প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। সেই বিপন্ন পরিস্থিতিতে খতিজাই হয়ে ওঠে তার অবলম্বন।

> তখন মহল্লার লোকের সামনে সম্ভবত জীবনে প্রথম বীরাঙ্গনা খতিজা প্রকাশিত হয়, সেদিন তার নামাজ কাজা হয়ে যায়, সে আসলামের বাপ আব্দুল কাদেরের আপত্তি অগ্রাহ্য করে রাবেয়াকে হাত ধরে রাজ্জাক ব্যাপারির বাসায় নিয়ে যায়, সেখানে হুমু জাহুকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার পর তাদেরকে বলে, তুমরা মহল্লায় যা মনে লয় কর, আমার কিছু না, তয় মোহাম্মদ সেলিম আমাগো বাইতে আমার লগে থাকব, লৌড়াইব না, তুমরা অর শইলে যুদি নিকি আত দেও আমি তুমাগো ঠ্যাং ভাইঙ্গা দিমু! ... আমরা, ভূতের গলির আসল ইন্দুর-বিলাই খেলাইনা পোলাপান, ধার করে বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধান নামক ঢাউস বইটা নিয়ে আসি এবং খুলে ৮২৪ পৃষ্ঠায় পাঠ করি : বীরাঙ্গনা- ১বি. বীর নারী, বীর্যবতী নারী (আমি বুঝলাম সে বীরাঙ্গনা আফগানের মেয়ে--নজরুল)। ২বি. বীরপত্নী। [বীর+অঙ্গনা, স.]। (জহির, ২০০৮ : ৭৩)

এর প্রতিক্রিয়ায় খতিজাকে সাঙ্গপাঙ্গসহ হুমু ও জাহুর অশ্রাব্য গালিগালাজ, বোমার আক্রমণ ও ভর্ৎসনার সম্মুখীন হতে হলেও তার রণরঙ্গিণী ভূমিকার কারণেই উক্ত মহল্লায় তাদের আধিপত্যের যবনিকা ঘটে। ভূতের গলির বাসিন্দাদের জীবনে নতুন উদ্দীপনা ও কলরোলের সমান্তরালে পূর্বোক্ত ক্রীড়ার স্বতন্ত্র স্বরূপ উন্মোচিত হয় সরকার কর্তৃক নির্বাচনী কর্মকাণ্ড পরিচালনার ঘটনায়। এতে রকেট মার্কার অধিকারী মিলন ও এরোপ্লেন মার্কার অধিকারী কালামের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ মাত্রা অর্জনে সক্ষম হয় মহল্লার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোট প্রদান বা এ কাজে বিরত থাকার ঘটনায়। সেক্ষেত্রে ভূতের গলির বাসিন্দা চন্দ্রকান্ত বসাক ও তার স্ত্রী সত্যলক্ষ্মীর মনোলোকে নির্বাচনী আবহ সঞ্চার ঘটায় অস্বস্তিকর ভীতিবোধ ও অজানা আশঙ্কার। কারণ, স্বেচ্ছায় ভোটপ্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা সবর্দাই মিলনের সমর্থক হলেও তার প্রতিপক্ষ কালামের নিকট এ বিষয়টি রীতিমতো পীড়াদায়ক। ভোটগ্রহণের পূর্বদিন কালামের পক্ষ থেকে উক্ত দম্পতিকে ভোট প্রদান না করার হুমকি জানানো হয়, এবং মিলনের পক্ষ থেকে ভোটদানের জন্য জোরালো অনুরোধ করা হয়। উভয় ঘটনার মিথস্ক্রিয়ায় তাদের অস্তিত্বগত সংকটের ভয়াবহতা সুতীব্র হয়ে ওঠে। কেননা, স্বাধীনভাবে ভেবে চিন্তে নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাগত অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। অর্থাৎ, কোনো কারণে যদি তারা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে অনিচ্ছুকও

থাকে, তবে এর পরিণতিতে বিষয়টি এভাবে বিবেচনার অবকাশ থাকে যে তারা এ নির্বাচনে মিলনের বিপক্ষে ও কালামের সমর্থক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিমাত্রই যখন এ ধরনের শৃঙ্খলিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তখন তাকে কোনোভাবেই নিজের পছন্দ ও আদর্শ অনুযায়ী মতামত প্রকাশের নিরপেক্ষ ও অনুকূল প্রতিবেশ হিসেবে দাবি করা যায় না। উক্ত নির্বাচনে মিলনের পরাজয় ও কালামের বিজয় নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি কোনো পক্ষের সদর্থক মানসিকতাবশত অভিনন্দন প্রকাশের পরিবর্তে ভোট দিতে যাওয়া-না যাওয়া এবং প্রতিপক্ষকে সমর্থনজনিত সন্দেহের উত্তপ্ত ও বিক্ষুব্ধ মানসিকতায় প্রতীয়মান হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি উভয় দলের আস্থাহীনতার বিষয়টি। সুতরাং বাধ্য হয়েই উক্ত দম্পতিকেও আশ্রয় নিতে হয় মিথ্যা ও কৌশলের। কেননা প্রকৃত ঘটনা জানানোর অনুকূল পরিস্থিতি মহল্লায় ইতোমধ্যেই বিলীয়মান।

উপর্যুক্ত ঘটনাসমূহের নেতিবাচক অভিঘাত মহল্লার শিশু, বালক ও কিশোরদের আচরণেও সঞ্চারিত হয়। তাই তারা 'ইন্দুর-বিলাই খেলা'য় ক্রমশই মেতে ওঠে, যদিও তাদের অভিভাবকদের এ বিষয়ে অসচেতনতা ও ভ্রূক্ষেপহীন মনোভঙ্গির জন্য ধীরে ধীরে বালকদের আচরণে বিস্তৃত হয় অপরাধীসুলভ আচরণ ও কর্মতৎপরতা। এক্ষেত্রেও যথারীতি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, নেতাসুলভ ও দাপুটে মনোভঙ্গির অধিকারী কিশোর পালন করে বিড়ালের ভূমিকা, যে মহল্লায় আগত নতুন বালকদের ওপর জারি করে তার যথেচ্ছ আদেশ ও স্বেচ্ছাচার – সবই এ খেলার নিয়ম, এ উপলক্ষে। বাবুল মিঞার বিড়ালের ভূমিকা সম্বন্ধে ইঁদুর হিসেবে খেলায় অংশগ্রহণকারী বালকদের মধ্যে কোনো সংশয় ও প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তার উত্তরে পুনরায় প্রতিধ্বনিত হয় এ মহল্লায় ইঁদুর ও বিড়াল হিসেবে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনকারীর প্রকৃত স্বরূপ – 'মহল্লায় যারা নতুন আসে তারা ইন্দুর হয়, আর পুরনোরা বিলাই, এটাই নিয়ম' (জহির, ২০০৮ : ৫৯)। এরই অনিবার্যতায় —

> আমাদের নাকমুখ প্রায়ই ফাটে, সার্টের হাতা ছিঁড়ে যায়, শরীর ধুলামলিন হয়, কিন্তু আমাদের খারাপ লাগে না; ইন্দুর হতে পারায় উল্লাস হয়। ... আমরা আমাদের ক্রমাগত ইন্দুর হওয়ার কথা কাউকে বলি না, কিন্তু তারপরও মহল্লায় এ কথা ফাঁস হয়ে যায় এবং আমাদের মার খাওয়ার কথা শুনে আমাদের বাপমায়ের মন খারাপ লাগে; ... বিলাইদের হাতে মার খেয়ে ধুলামাখা হয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার পর তারা আমাদেরকে আবার পেটায়, আমাদেরকে গাধার বাচ্চা বলে গাল দেয়, বলে, খালি ইন্দুর হচ, বিলাই হয়া পারচ না! ... পাশের বাড়ির ভাড়াইটার পোলা বাবুল মিঞা এবং তার দলের হাতে মার খাওয়ার বিষয়টা আমাদের বাড়িওয়ালি পারভিনেরও সহ্য হয় না, সে আমাদের মায়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের জন্য পরিস্থিতি আরো জটিল করে তোলে; ... হাত নেড়ে বলে, খেইলের নামে খালি মাইর খাচ, মাগি নিহি তরা! (জহির, ২০০৮ : ৫৯-৬১)

এসব ইঁদুর জননীরাই খতিজার মতো বীরাঙ্গনা নারীকে তার দুঃসাহসী ভূমিকা সম্পাদনের কারণে 'নষ্ট মেয়েমানুষ' হিসেবে অভিহিত করে। উপর্যুক্ত ঘটনাসমূহে এতদঞ্চলের জনজীবনের নেতিবাচক মানসিকতাই পরিস্ফুট হয় এবং সেকারণেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ভূতের গলিতে যে 'ইন্দুর-বিলাই খেলা' ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকে, এমন

ইঙ্গিতের মাধ্যমেই গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটে। নিঃসন্দেহে লেখক এতদঞ্চলের মানুষের সার্বিক জীবনবোধ সম্পর্কে আশাবাদী, কিন্তু সামাজিক প্রতিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে তাদের চেতনালোকে বিস্তৃত আত্মকেন্দ্রিক মনোভঙ্গিই মূলত এ গল্পে তাঁর ভাষ্যে উপস্থাপিত—

> এই খেলার শেষ নাই, খেলোয়াড়ের শেষ আছে; খেলোয়াড় খেলা ছেড়ে যায়, কিন্তু খেইল জারি থাকে। উল্লেখ্য যে, বালকদের খেলা ছাড়া অন্যান্য খেলার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন কারণে, যেমন : বুইড়া হয়ে গেলে বা মরে গেলে অথবা খেলতে খেলতে ক্লান্ত বা বিরক্ত হয়ে গেলে কিংবা জীবনে হঠাৎ দরবেশি ভাব দেখা দিলে, কেবল বিলাইরা ইচ্ছা করে খেলা ছেড়ে যেতে পারে, ইন্দুররা পারে না; বিলাই খেলতে চাইলে ইন্দুরকে খেলতে হবে। (জহির, ২০০৮ : ৮০)

মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে এর পরবর্তী দুই দশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সার্বিক ভঙ্গুরতা ও পচনশীল রূপটির অকপট শব্দচিত্র নির্মাণে এ গল্পে লেখকের ভূমিকা বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উন্মোচনকারী সাংবাদিকের চেয়েও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ সমাজদেহে প্রবহমান ঘটনাসমূহের বিবরণদানই তাঁর একমাত্র অন্বিষ্ট নয়। বরং যে জীবনপ্রবাহের তিনিও স্বতঃস্ফূর্ত অংশীদার. তার বিনষ্টি ও কদর্যতা লেখক হিসেবে শহীদুল জহিরের সংবেদনশীল চেতনালোককেও বিক্ষুব্ধ করে। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় হলেও এর সমান্তরালেই অবস্থান পাক হানাদারদের অপতৎপরতা ও তাদের সহযোগী রাজাকারদের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালনের বিপরীতে প্রাণভয়ে ভীত সাধারণ মানুষের আত্মরক্ষার তাগিদ। অস্ত্রের জোরে বাহুবল প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেদের বিড়াল হিসেবে প্রতিষ্ঠার আধিপত্যপ্রবণ মানসিকতার সূত্রপাত পাক সেনাদের অপতৎপরতায় বিভিন্নভাবে বাস্তবায়িত হয়। তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় অস্ত্রহীন ও আকস্মিকভাবে রাতের অন্ধকারে কাপুরুষোচিত হামলায় হতভম্ব ও দিশেহারা ভূতের গলির মহল্লাবাসীর ভুমিকা পূর্ববর্তীদের সঙ্গে প্রতিতুলনায় নিঃসন্দেহে ইঁদুরের। এভাবেই উক্ত মহল্লার ক্ষমতালিপ্সু বাসিন্দাদের চেতনালোকে সঞ্চারিত হয় অন্যকে হয়রানি, পরাস্ত করার অপপ্রয়াস — যার সর্বশেষ সংক্রমণের শিকার মহল্লার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

'প্রথম বয়ান' গল্পে ব্যর্থ প্রেমের বেদনাতুর স্মৃতিরাশির অভিঘাত কীভাবে ব্যক্তিকে একাকিত্বের দুর্মর পীড়নে পিষ্ট করে, তার রূপায়ণ লক্ষণীয় আবদুর রহমান চরিত্রে। অপরিমিত কৌতূহলের কারণে প্রেমিকার অব্যক্ত ইশারার অর্থ সম্পর্কে অসচেতনতাবশত সমগ্র জীবন পরিক্রমায় অতীতের বৃত্তে পুনঃপুন প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হওয়াই তার চরম ট্র্যাজেডি। যে নারীকে সে অনায়াসেই জীবনসঙ্গী করতে পারত, নিজের অজান্তেই তাকে হারানোর দুঃসহ মনস্তাপ থেকে তাই তার মুক্তি ঘটে না। স্ত্রীর নিকট উপর্যুক্ত ঘটনা সংগুপ্ত রাখার সচেতন অভিপ্রায় অবশেষে তাকে শুধু মানসিকভাবেই নিঃসঙ্গ করে তোলে না; শারীরিকভাবেও ব্যাধিগ্রস্ত করে। এ গল্পেও লেখক যথারীতি ভূতের গলির প্রেক্ষাপটে সমষ্টিমানুষ বা মহল্লাবাসীর সঙ্গে সম্পৃক্ততার সূত্রে ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক আবেগ-অনুভবের বিচিত্র রূপায়ণে আগ্রহী, তবে এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ঘটনা সংঘটনের নেপথ্যে অন্যান্য গল্পের মতো ততটা সক্রিয় নয়। বরং গল্পের প্রধান পাত্র-পাত্রীর নির্ধারিত ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই এর আখ্যান অর্জন করে সামগ্রিকভাবে ক্রমবিন্যস্ত পরিণতি। গল্পের নায়ক

আবদুর রহমানের জীবনে নাটকীয়ভাবে সুপিয়া আকতারের আবির্ভাব তাকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্তহীনতার যে গোলকধাঁধায় চল্লিশ বছর পূর্বের স্মৃতিলোকে অবরুদ্ধ করে, সেই অবস্থান থেকে উত্তরণের পরিবর্তে স্বেচ্ছায় সেই অতল গহ্বরে নিমজ্জনই হয়ে ওঠে তার ভবিতব্য। ভূতের গলির রাস্তার কিনারে মন্দিরের নিচু বারান্দায় গ্রাজুয়েট স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র আবদুর রহমানের সঙ্গে উক্ত মহল্লার বাসিন্দা তরুণী সুপিয়া আকতারের প্রথম সাক্ষাৎ যথেষ্ট নাটকীয়। আম্মা বা দাদির সঙ্গে এক বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে চম্পা ফুল হাতে নিয়ে তাকে মহল্লায় প্রবেশ করতে দেখা যায়। কারণ আকস্মিকভাবেই উক্ত ফুলের প্রতি তার ঝোঁক জেগে ওঠে। তাই পথবর্তী কোনো এক বাড়ির বাসিন্দা জনৈক যুবকের (যে হয়ত দোলাই খালের লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ী এবং যার নাম হয়ত আব্দুর রশিদ কিংবা আব্দুল জব্বার কিংবা নজরুল ইসলাম) নিকট সে চম্পা ফুল প্রাপ্তির অভিলাষ ব্যক্ত করায় উক্ত যুবকের প্রযত্নে অবশেষে 'সুপিয়ার হাতের সবুজ পাতায় সমৃদ্ধ লম্বা ডালটায় চম্পা অথবা ঘিয়া রঙের এক ফুল দেখা যায়' (জহির, ২০০৮ : ৮৬)। এ পর্যায়েই মন্দিরের সামনে তাদের দেখা হয়। বয়সের চাপল্য ও দুরন্ত আবেগের তাড়নায় সুপিয়া সঙ্গী অভিভাবকের দৃষ্টি এড়িয়ে কৌশলে আব্দুর রহমানের কোলে ডালটি নিক্ষেপ করলেও তার মনোযোগ ফুল বা ফুল নিক্ষেপকারীর পরিবর্তে অন্যত্র সঞ্চারিত হয়। তখন দক্ষিণ মৈশুন্দির জনৈক বাতিওয়ালার রাস্তার মোড়ে কাঁচের বাক্সে হারিকেনের বাতি জ্বালানোর দৃশ্যে সম্মোহিত আব্দুর রহমান সেখানে গমন করে।[১৬] অবশেষে যখন তার ঘোর কাটে বাতিওয়ালার প্রস্থানের ঘটনায়, ততক্ষণে রাস্তার মোড় থেকে মন্দিরের বারান্দায় প্রত্যাবর্তনের এক পর্যায়ে সেখানে তার রেখে আসা চম্পা ফুলের ডালটি অদৃশ্য হয়ে যায়। 'তখন হয়তো তার একবার মনে হয় যে, চম্পা ফুলের ডালটা আবুল হোসেন নিয়া গেছে, অথবা তার হয়তো কিছুই মনে হয় না' (জহির, ২০০৮ : ৮৭)। অর্থাৎ ফুল প্রদানপূর্বক সুপিয়ার প্রেম নিবেদন তার নিকট আদৌ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয় না। পরবর্তী দুদিন এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলে। তৃতীয় দিন আবদুর রহমানকে ফুলের ডাল প্রদানের পরবর্তী পর্যায়ে সুপিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেও এর গূঢ়ার্থ অনুধাবন আব্দুর রহমানের পক্ষে দুর্বোধ্য বিবেচিত হয়। অতঃপর একসময় সুপিয়ার পরিবার ভূতের গলি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় তাদের পুনরায় সাক্ষাতের অবকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে নাটকীয়ভাবেই এর পরবর্তী পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মার্চ মাসের শেষে বা এপ্রিলের প্রারম্ভে পাক বাহিনীর কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য জিঞ্জিরায় আশ্রয় গ্রহণকালে পুনরায় তাদের দেখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়ায় আব্দুর রহমানের মনোজাগতিক সংকটের সূত্রপাত ঘটে। কারণ 'জিঞ্জিরায় সুপিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের এই দিন আব্দুর রহমানের এই দুঃখ অথবা শোকের জন্ম হয়' (জহির, ২০০৮ : ৮৫) এবং গল্পের প্রারম্ভেই জানা যায়, এর ধারাবাহিকতায় 'ভূতের গলিতে আব্দুর রহমান এই অবস্থায় পড়ে চাপা খায়া থাকে।' (জহির, ২০০৮ : ৮১)। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জিঞ্জিরার চরাইল গ্রামের ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের বাড়িতে আকস্মিকভাবেই দেখা হওয়ার এক পর্যায়ে আব্দুর রহমান সুপিয়ার নিরুদ্দেশ হওয়ার বৃত্তান্ত সম্পর্কে অবহিত হয়। সুপিয়ার নানির অসুস্থতা ও মৃত্যুর পরবর্তীকালে চম্পা ফুলের ডাল প্রদানকারী দোকানদার যুবকের সঙ্গে সুপিয়ার বিয়ে হয়। এর পরিণতিতেই ধীরে ধীরে সময়ের অভিঘাতে তার অন্তর্লোকে আব্দুর রহমানের প্রতি

জাগ্রত প্রেমের তিরোধান ঘটে। আব্দুর রহমানের নিকট সমগ্র ঘটনাটি বিস্ময়কর, এমনকি অবিশ্বাস্য বিবেচিত হয়। কারণ তার স্বভাবে রয়েছে আপাত নিষ্ক্রিয়তা ও উদ্যমহীন মনোভঙ্গি। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় সুপিয়ার সংলাপে ব্যক্ত হয় তার প্রতি পরোক্ষ আক্ষেপ ও ভর্ৎসনা — 'চাইলে পাইব না ক্যান' (জহির, ২০০৮ : ৮৯)। অর্থাৎ আব্দুর রহমান সচেষ্ট হলে সুপিয়া তারই ঘরণী হতে পারত। চম্পা ফুলের প্রসঙ্গকে সুপিয়া স্বেচ্ছায় ভুলে যেতে সচেষ্ট, কেননা তার জীবনে প্রথম প্রেমের ব্যর্থতা শুধুই বেদনার স্মারক। তবু অবশেষে সে আব্দুর রহমানের নিকট উন্মোচন করে অতীতের সেই দুর্বিষহ স্মৃতিরাশি —

> সেদিন সুপিয়া আকতারকে অবশেষে চম্পা ফুলের গল্প করতেই হয়, সে বলে যে, চম্পা ফুলের ডাল আব্দুর রহমানের কোলের উপর ফেলায়া দেওয়ার ১ম দিন আব্দুর রহমান যখন বাত্তিওয়ালার পিছনে উঠে যায়, সে কিছুক্ষণ খাড়ায়া থাকে তারপর ডালটা আবার নিজেই তুলে নিয়া আসে। ২য় দিন হয়তো তার মনে হয় যে, এই দিন সব ঠিক হয়া যাবে, কিন্তু তা হয় না, আব্দুর রহমান বাত্তিওয়ালার পিছনেই যায়। দুই দিন আব্দুর রহমানের এরকম আচরণের পর ৩য় দিন তার প্রথম থেকে ভয় হয় এবং সে চিন্তা করে সন্ধ্যায় বাত্তিওয়ালা যখন আসে তখন সে মহল্লায় ফিরবে না; কিন্তু এ বিষয়ে তার কিছুই করার থাকে না, কারণ তাকে তার আম্মা এবং দাদির সঙ্গে সন্ধ্যা বেলাতেই মহল্লায় ফিরতে হয়, এবং এদিনও আব্দুর রহমান একই কাজ করে। (জহির, ২০০৮ : ৯৩)

জিঞ্জিরায় সেই রাতে এ দুই নর-নারীর অতীতের নিষ্ফল প্রেমের স্মৃতিচারণার একপর্যায়ে রাতের অন্ধকারে কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে সুপিয়ার ঈষৎ নগ্ন দেহের অনিন্দ্য সৌন্দর্যের মোহে আব্দুর রহমানের অবচেতনে ধ্বনিত হয় প্রবল হাহাকার। সেইসঙ্গে অবিবেচক হিসেবে নিজের ওপর জন্মে প্রচণ্ড ক্রোধ; যদিও এ আবেগ সুপিয়ার নিকট মূল্যহীন। কারণ ইতোমধ্যেই সে সামাজিকভাবে অন্যের পরিণীতা। 'তখন আব্দুর রহমানের এই শোক হয়, এবং সে তা অনেক দিন চেপে রাখে, কিন্তু শেষে সে মাথা ধরার ব্যারামে আক্রান্ত হয় এবং গোপনে রাস্তার কিনারায় কেরাসিন বাত্তির জায়গা খোঁজার ছলে হয়রান হয়ে অন্য কিছু খোঁজে' (জহির, ২০০৮ : ৯৩)। ঝর্ণা বেগমকে বিয়ের পর সাংসারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েও তার মনোভূমিতে ক্রমশই প্রসারিত হয় প্রবল নৈঃসঙ্গ্যবোধ, যা তাকে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের ব্যবধানেও ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবুল হোসেনকে নিয়ে অসীম ধৈর্য সহকারে রাস্তার মোড়সমূহে কাচের বাক্সে প্রজ্বলিত হারিকেনের খুঁটি অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবেই সে হারানো অতীতের অনুসন্ধানে পেতে চায় পরমার্থের আস্বাদ।[১৭] লেখক এ গল্পে সুকৌশলে আব্দুর রহমান ও সুপিয়ার ব্যর্থ প্রণয়কাহিনীকে পল্লবিত করতে দুটি প্রতীককে অবলম্বন করেছেন। কাচের বাক্সে প্রজ্বলিত হারিকেনের আগুনের শিখার বিচ্ছুরণ প্রকৃতপক্ষে আব্দুর রহমানের যৌবনের উন্মেষপর্বের দুর্বার উদ্দীপনা ও চাঞ্চল্যের প্রতীক। এরই সম্মোহনে তার স্বাভাবিক বিবেচনাবোধ মোহগ্রস্ত হয় বলেই চম্পা ফুলের প্রতীকে তার প্রতি সুপিয়ার হৃদয়ে সিঞ্চিত প্রেমের আহবানে সাড়া প্রদান তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তাই সুপিয়াকে হারিয়ে বিরহীচিত্তে সে হয়ে ওঠে আশাহত। অতঃপর নবোদ্যমে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে যৌবনের পথে প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টায় সে হয়ে ওঠে অতীতচারী। কিন্তু মানুষ সময়ের শৃঙ্খলকে অতিক্রম করতে অক্ষম। সেকারণেই তার এ ব্যর্থ প্রচেষ্টা যখন পরিবার ও মহল্লায় প্রকাশিত হয়, তখন আব্দুর রহমান সচেতনভাবেই তাদের নিবৃত্ত করতে জানায়,

সুপিয়া নাম্নী কোনো তরুণী আদৌ ভূতের গলির হুমায়ুনদের বাসায় ভাড়াটে ছিল না। যে তাদের ভাড়াটে ছিল তাদের মেয়ের নাম ছিল শামিমা। এভাবেই সে নিজের ব্যথিত চিত্তকে প্রশমিত করতে শরণাপন্ন হয় মিথ্যার, যদিও এ সত্য বিস্মৃত হতে সে অপারগ যে, সুপিয়া অন্যের স্ত্রী এবং তার জীবন থেকে সুপিয়া চিরতরে হারিয়ে গেছে। ব্যক্তিচিত্তে অমলিন বিগত প্রেমের স্মৃতি কীভাবে তাকে অহর্নিশ মনঃপীড়ায় দগ্ধ করে তারই সকরুণ ভাষ্যচিত্র এ গল্প।

পুরনো ঢাকার আমজনতার নিত্যদিনের ব্যবহৃত ভাষার প্রধানতম বৈশিষ্ট্যই হলো, তা একান্তই সাবলীল ও গতিময়;[১৮] যদিও নিম্নশ্রেণির মানুষের আড্ডা, গালিগালাজ ও বাক-বিতণ্ডার আবহসূচক অমার্জিত, অশ্রাব্য শব্দরাজি ও প্রবাদ-প্রবচনের উপস্থিতি সেখানে অপরিহার্য। এছাড়া, অঞ্চলভেদে উপভাষা ও প্রচলিত শব্দসমূহের বিকৃত রূপও এতে অবলীলায় স্থান পায়। বাংলা ভাষার প্রমিত রূপের চেয়ে বরং শহর ও গ্রামের মিশ্রিত শব্দের পাশাপাশি বিভিন্ন বিদেশি সমাহারও পুরনো ঢাকার অধিবাসীদের নিকট অধিক সমাদৃত। শহীদুল জহিরের আলোচ্য গল্পসমূহে এ ভাষার প্রয়োগ লক্ষ করলে সহজেই প্রতীয়মান হয়, তাদের উচ্চারিত সংলাপ কোনো বিশেষ পরিমার্জনা বা হিসেব-নিকেশপূর্বক শ্রোতার উদ্দেশে কথিত নয়। বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তারা একই বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তির পাশাপাশি দেহভঙ্গি এবং আভাস-ইঙ্গিতের ব্যবহারেও স্বচ্ছন্দ। যেমন —

> ভিক্টোরিয়া পার্কের বিকেলের আলোয় সবুজ ঘাসের ওপর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা দেখে যে, তার উত্তোলিত হাতে সে একটি শুকনো এবং ধূসর রঙের হাড় ধারণ করে আছে। এইটা কি? ... একটি জলজ্যান্ত হাড় দিনের স্পষ্ট আলোয় তুলে ধরে এটা কি বললে ব্যাপারটা রহস্যময় হয়ে যায়। তখন লোকটি পুনরায় ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং ঈষৎ বাঁক-খাওয়া হাড়টি আন্দোলিত করে বলে, কন, কন, এইটা কি; ভালা কইরা দেখেন, ভালা কইরা দেইখা কন; এবং তখনো সম্মুখে দণ্ডায়মান লোকেরা চুপ করে থাকলে ... সে বলে, কন এইটা কি? কন- এবং তারপর সে নিজেই বলে, এইটা হাড্ডি, এই যে গলার নিচে দেখেন, এইটা এই গলার হাড্ডি। (জহির, ২০০৬ : ৮৩-৮৪)

এতদঞ্চলের গণমানুষের ভাষার স্বকীয়তা হলো, খিস্তি-খেউড় ও অশ্লীল সম্বোধনের মাধ্যমে অন্যকে আঘাতের হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগের সমান্তরালে তাদের অন্তর্লোকের স্বরূপ অর্থাৎ ক্রোধ, বিরক্তি, অসহায়ত্ব ও ধৈর্যচ্যুতি, মমত্ববোধ ও প্রণয়াবেগও কথোপকথনের আশ্রয়ে প্রকাশিত[১৯]। যেমন —

> আপনের শ্রমিক নেতা হালায় কি আবার গ্যাঞ্জাম করতাছে? ...
> হের আমরা কি করুম; হাঁচ্চি হালায় তো চাক্কুরে ডরাইব না,
> ---
> আপনের হালায় আচ্চি হইব, খাছি অনব, হ্যার আমরা কি করুম! (জহির, ২০০৬ : ৯৬-৯৭)

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তে 'হালায়' শব্দের মূল রূপ 'শালা'ও এর পূর্ব রূপ অর্থাৎ 'শ্যালক (স্ত্রীর ভাই) শব্দের বিকৃত উচ্চারণে আত্মীয়তার সম্পর্কগত স্বরূপ নির্দেশের পরিবর্তে অন্যকে গালাগালের কদর্য সম্বোধন হিসেবে গ্রামীণ সমাজে বহুল প্রচলিত। তাছাড়া পুরনো ঢাকার পরিসরেও এর বিশিষ্ট প্রয়োগ ওপরের উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয় ('এই সময়' গল্পে)। উক্ত

উদাহরণটির প্রথম বাক্যে ভূতের গলির তিন মাস্তান ভাইয়ের এ সম্বোধনের উদ্দীষ্ট কর্তা হলো, এরশাদ সাহেবের সুতাকলের শ্রমিক নেতা। অতঃপর এর লক্ষ্যবস্তু হলো, এরশাদ সাহেবের শারীরিক অসুস্থতার প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত 'হাঁচি'; পরিশেষে হোটেল মালিক মালেকা বানু — যে স্বীয় ব্যবসায়িক স্বার্থে অর্থের বিনিময়ে তিন ভাইকে পেশীশক্তির প্রয়োজনে ব্যবহারে স্বচ্ছন্দ।

নারীদের কথোপকথনে অপভাষার প্রয়োগ পুরুষদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হলেও বাদ-প্রতিবাদের ক্ষেত্রে তাদের সংলাপ আক্রমণাত্মক; এমনকি কখনো কখনো নিজের দাপুটে মনোভঙ্গি প্রকাশের আগ্রহে গালি-গালাজের পরিবর্তে প্রতিপক্ষের স্বভাবে নেতিবাচকতা আরোপের প্রচেষ্টাও লক্ষণীয় —

– ব্যাড়ির মইদ্দে আইন্না আন্ডার গাছ লাগাইচে, দিনের বেলা একটুও রইদ আহে না।
– গাছ বাড়ির মইদ্দে লাগামু নাতো কই লাগামু, রাস্তায় লয়া যায়া লাগামু!
– রাস্তায় লাগাইবেন ক্যালা, আইনাতো দেওয়ালের কইলজার বিতরে লাগাইছেন!
– আমার গাচ আমি মাইনষের কইলজার ভিতরে লাগাই নাইকা, আমার বাড়ির ভিতরেই লাগাইচি!
– ছেওয়াটাতো এই বাড়ির মইদ্দে আয়া পইড়া থাকে, শীত/গরম কুনোদিন ইকটু রইদও আহে না বাইতে।
– বাড়ি তুইলা লয়া অইন্যখানে যাও গা, বেটি, ছেওয়া পড়ব না।
বেটি বলায় পারভিনের সহ্য হয় না, সে ফেটে পড়ে।
– বেটি বেটি করেন ক্যালা, বদখাসলত বুড়ি! (জহির, ২০০৮ : ৬০)

বিভিন্ন ছড়ার ব্যবহার 'ইন্দুর-বিলাই খেলা' গল্পে লক্ষণীয়, যেখানে লেখক পুরনো ঢাকায় শিশু ও বালকদের পাশাপাশি বয়স্ক মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছড়াও নির্দেশ করেছেন। স্বল্পবয়সীদের ক্ষেত্রে ছড়া নিছক নির্মল চিত্তবিনোদনের উৎস হলেও প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে তা মূলতই স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। যেমন —

ক. ধর চিকা মার চিকা
চিকার দাম পাঁচ সিকা (জহির, ২০০৮ : ৫৯)
খ. ভোট দিবেন কিসে? রকেট মার্কা বাক্সে।
তোমার ভাই, আমার ভাই। মিলন ভাই, মিলন ভাই।
ভোট দিবেন কিসে? এরোপ্লেন মার্কা বাক্সে।
তোমার ভাই, আমার ভাই। কালাম ভাই, কালাম ভাই।
কালাম ভাই যেখানে, আমরা আছি সেখানে।
মিলন ভাই যেখানে, আমরা আছি সেখানে। (জহির, ২০০৮ : ৭৬)

শহীদুল জহিরের ছোটগল্পে পুরনো ঢাকার বাসিন্দারা বিশেষভাবেই গোষ্ঠীবদ্ধ এবং সমষ্টিচেতনায় আস্থাশীল। ব্যক্তি-বিচ্ছিন্নতার একমাত্র উদাহরণ হিসেবে আমরা 'চতুর্থ মাত্রা' গল্পের আব্দুল করিমকে নির্বাচনে সমর্থ হলেও লেখক দেখিয়েছেন — বহির্জগতের সঙ্গে যোগসাধনে সে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। অন্তর্লৌকিক নৈঃসঙ্গ্যবোধের শৃঙ্খলে তার অবরুদ্ধতার বীজ পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ ও সমাজদেহেই প্রোথিত থাকায় এর পীড়ন থেকে

মুক্তিসাধনে সে অসমর্থ। এরই বিপরীত প্রান্তে অবস্থান 'ডুমুরখেকো মানুষ' গল্পের ডুমুর ক্রেতা এগারোজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও ভিক্টোরিয়া পার্কে উপস্থিত অবশিষ্ট বালকবৃন্দের। এছাড়া অবশিষ্ট (আলোচ্য) প্রতিটি গল্পেই প্রত্যক্ষভাবে মহল্লাবাসীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। তারা প্রায়শই নামহীন এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ের চেয়ে সমষ্টির অংশ হিসেবেই ভূমিকা পালনে আগ্রহী। যারা এসব গল্পের কেন্দ্রীয় ও প্রধান চরিত্র, তাদের সঙ্গেও মহল্লাবাসীর অন্তর্গত ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র পরিচয়ে (পারিবারিক ও সামাজিক বিবেচনায়) তেমন ভিন্নতা নেই। যেমন – 'প্রথম বয়ান' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আব্দুর রহমান ও প্রধান চরিত্র সুপিয়া আকতারের জীবনাখ্যানের যে পরিপ্রেক্ষিত, তা অবধারিতভাবেই মহল্লাকেন্দ্রিক এবং তাদের পরিণতিও মহল্লাবাসীর চেয়ে স্বতন্ত্র নয়। অর্থাৎ মহল্লার অন্য যে কোনো নারী বা পুরুষের জীবনবৃত্ত এ দুজনের মতোই হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যে মানদণ্ডে তারা অন্যদের থেকে পৃথক, তা হলো বেড়ে ওঠার পারিপার্শ্বিক প্রভাবে তাদের মনোভঙ্গিগত স্বাতন্ত্র্য, চিন্তা-ভাবনার নিজস্বতা ও ব্যক্তিত্ববোধ। তবে লেখকের পক্ষপাত যে সমষ্টিমানুষের প্রতি এবং তাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকারা যে মহল্লাবাসীর সঙ্গে সমন্বিত হয়েই জীবনান্বেষায় অবিরাম উদ্যমী, তার দৃষ্টান্তসমূহ আলোচ্য গল্পসমূহে লক্ষণীয়। সেকারণেই স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে তারা প্রত্যেকে ভিন্ন চিন্তার পরিবর্তে সমবেতভাবে একই চিন্তায় মগ্ন হয়। এমনটি যদিও বাস্তবতাবিরহিত এবং অযৌক্তিক, তথাপি তাদের সমধর্মী মানসিকতার গড়ন সম্পর্কে ধারণাদানের আগ্রহই লেখককে এ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

এভাবেই পুরনো ঢাকার অধিবাসীদের যূথবদ্ধতার বহুমাত্রিক রূপায়ণের মাধ্যমে শহীদুল জহির এতদঞ্চলের মানুষের নিজস্ব ধরনের সামগ্রিক জীবনভঙ্গি, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশার সমান্তরালে বহমান রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংকটের কথক হিসেবে পালন করেন নিস্পৃহ ভাষ্যকারের ভূমিকা। তাঁর গল্পসমূহ বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় বিষয় ও শৈলীগত মানদণ্ডে গতানুগতিকতাকে অতিক্রমপূর্বক ভাস্বর অবস্থানে উত্তীর্ণ। সাধারণ পাঠকের অলস সময় কাটানোর মাধ্যম হিসেবে তাঁর গল্প যথোপযুক্ত নয়। বরং নিজ গল্পের অনুরাগী হিসেবে সচেতন ও বিচক্ষণ পাঠককেই তিনি প্রত্যাশা করেন। তাই গতানুগতিকতাকে পরিহারপূর্বক নতুনভাবে চিন্তার সামর্থ্য ব্যতীত শহীদুল জহিরের গল্পপাঠের মর্মার্থ অনুধাবন দুষ্কর। কেননা, প্রায়শই তাঁর গল্পে বাঙালি জীবনের একান্ত সাদামাটা রূপটি ভিন্ন কাঠামোর পরিসরে স্বতন্ত্র মাত্রায় উপস্থাপিত হয় বলে তা থেকে বিশেষ কোনো বক্তব্য অনুধাবনের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভুবনে তিনি নতুন পথের দিশারী হিসেবে যথাযোগ্য স্বীকৃতির অন্যতম দাবিদার।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. শহীদুল জহিরের (১৯৫৩-২০০৮) জন্মস্থান ৩৬, ভজহরি সাহা স্ট্রীট (ভূতের গলি), নারিন্দা, ঢাকা। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম মোঃ শহীদুল হক। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি 'শহীদুল জহির' নাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নুরুল হক, মাতা জাহানারা খাতুন। তাঁর পিতামহ জহিরউদ্দিনের নামের শেষাংশ যুক্ত করেই তিনি নামের পরিবর্তন ঘটান। তাঁর স্থায়ী নিবাস সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার হাশিল গ্রামে। পেশায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপদস্থ আমলা হলেও তিনি নেশায় ছিলেন কথাসাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্যকর্মসমূহের তালিকা নিম্নরূপ —

ছোটগল্প : *পারাপার* (১৯৮৫), *ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প* (১৯৯৯), *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প* (২০০৪)।

উপন্যাস : *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* (১৯৮৭), *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* (১৯৯৫), *মুখের দিকে দেখি* (২০০৬), *আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু* (২০০৯)।

২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের স্ত্রী সুরাইয়া ইলিয়াসের ভাষ্যে উপস্থাপিত হয়েছে পুরনো ঢাকার জনজীবনপ্রবাহের একান্ত নিজস্ব অভিব্যক্তি, যা ক্রমশ বর্ধিষ্ণু নতুন ঢাকার সার্বিক নগরয়াণপ্রণালি থেকে ব্যতিক্রমী —

(পুরনো ঢাকার মহল্লাসমূহে) ... কোনো না কোনো বস্তি আছে, অথবা ছোট রাস্তা, ঘিঞ্জি এলাকা, রিকশাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, কুলি মজুরের হৈচৈ, রাস্তার ধারে ছোট ছোট পান বিড়ির দোকান—সকলের মিলিত চেঁচামেচি—সব মিলিয়ে একটা দুঃসহ পরিবেশ। ... ছোট গলিটার মুখে উলটা দিকে বড় গলিটার কিনার ঘেঁষে প্রায় ২০০/৩০০ গজব্যাপী সুইপারদের সব ঝুপড়ি ঘর ... দিনে এরা সব কাজ করতে যেত। ড্রেন পরিষ্কারের কাজ, রাস্তা ঝাড় দেওয়ার কাজ, বড়ো সার্ভিস পায়খানা পরিষ্কারের কাজ ইত্যাদি। কিন্তু রাত্রি বেলায় এই বস্তি একেবারে উথাল-পাতাল। ভাত পচা দেশি মদ খেয়ে নারী-পুরুষ সব একেবারে নাচে গানে চিৎকারে-হৈ হুল্লোড়ে, ঢলাঢলি, ল্যাংটালেংটিতে সারা এলাকাকে টাল মাটাল করে রাখত এবং চলত গভীর রাত পর্যন্ত। ... পুরোনো ঢাকার লোহার পুলের দক্ষিণে গ্যান্ডারিয়ার এক গলির মধ্যে ... যত আদি বাসিন্দাদের বাড়ি ঘর। গলি থেকে মেইন রোড (১০০ গজ মত দূর)-এ বাহির হলে সে আর এক দৃশ্য। মেইন রোড মানে পুরোনো ঢাকার মেইন রোড, অধিকাংশ রাস্তাতেই পাশাপাশি দুখানা গাড়ি চলা কঠিন, কোথাও একখানা গাড়ি তাও খুব সাবধানে না চালালে পাশের পানবিড়ির দোকানের সাথে অথবা পায়ে-হাঁটা মানুষের গায়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা যথেষ্ট। আর লোহার পুলের উপরের দুপাশের ফুটপাত ভর্তি যত সব ফেরিওয়ালার দোকান। পানসিগারেট, চকলেট, বিসকুট, আলুর পুতুল, নানা রকম সস্তা খেলনা ইত্যাদি ছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময় উৎপন্ন নানা রকম ফলমূল ... লোহার পুলের ফুটপাতে বিক্রি হত। একদিকে ক্রেতা বিক্রেতার হৈ চৈ, এছাড়া ছিল ব্রিজের ঢালু নিচু রাস্তায় যাত্রীসহ রিকশাকে পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে ব্রিজের উপরে তোলার জন্য ডজন ডজন কিশোর তরুণ কুলি কামলার হৈ চৈ। সব মিলিয়ে এই এলাকা ছিল উত্তপ্ত ও অস্বস্তি কর। ... পুরোনো ঢাকার পরিবেশটাই বিপুল সংখ্যক খেটে-খাওয়া নিম্নশ্রেণীর লোকের বাসস্থান বলেই ঘন বসতিপূর্ণ এবং হৈ হুল্লোড়ে ভরপুর। এখানে ঘোড়াগাড়িওয়ালা, রিকশাওয়ালা, ঠেলাগাড়িওয়ালা, বাস-ট্রাকের ড্রাইভার, হেলপার, কন্ডাক্টার, কলকারখানা ও দোকানের কর্মচারী, শ্রমিক ইত্যাদি জনগণের বাস বলে এখানকার জীবনধারণের বৈশিষ্ট্যই ছিল আলাদা। [আলাউদ্দিন মণ্ডলকে প্রদত্ত সুরাইয়া ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার, (আলাউদ্দিন, ২০০৯ : ৫৬৮-৫৭০)]

৩. 'শহীদুল জহির ৩৬, ভজহরি সাহা স্ট্রীট (ভূতের গলি), নারিন্দা, ঢাকায় ১৯৫৭–১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন'। [শহীদুল জহিরের জীবন ও গ্রন্থপঞ্জি, (রশিদ, ২০১০ : ৬৬৫)]। এসময় তিনি যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেন — 'সিলভারডেল কিন্ডারগার্টেন স্কুল, র‍্যাংকিন স্ট্রীট, ঢাকা। কেজি ১-২, স্ট্যান্ডার্ড ১-২, ১৯৫৮-১৯৬১। সেন্ট যোশেফ টেকনিক্যাল স্কুল, নারিন্দা, ঢাকা, স্ট্যান্ডার্ড-৩, ১৯৬২। কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা, পঞ্চম, ১৯৬৩।' (রশিদ, ২০১০ : ৬৬৪) তাঁর অনুজ হাবিবুল হক জানিয়েছেন —

শহীদভাই সেন্ট যোসেফ থেকে পরে সদরঘাটে কলেজিয়েট হাই স্কুলে ভর্তি হন। ভূতের গলিতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন অনেকটাই ছকে বাঁধা ছিল। স্কুলে যাওয়া, বাজার করা, (শহীদভাই অথবা আমাকে ঠাটারি বাজার অথবা রায়সা বাজার থেকে বাজার করতে হত), পাড়ায় রাস্তায় খেলাধুলা করা আর সন্ধ্যায় হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসা। দস্যিপনা করার সুযোগ তেমন ছিল না ঘোরাঘুরি করা ছাড়া। হয়তো তার বন্ধু ফখরুল আলম লেদুর সাথে বলধাগার্ডেন, খ্রিস্টীয় কবরস্থান. গৌড়ী মঠ অথবা দূরে হলে বাহাদুর শাহ পার্কে ঘুরে আসা। ['অনুজের কথা', (রশিদ, ২০১০ : ৫২৬)]

ফখরুল আলম লেদু শহীদুল জহিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত পুরনো ঢাকার শৈশব স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার সঙ্গে আলোচ্য গল্পসমূহের বিভিন্ন অনুষঙ্গগত সাদৃশ্য লক্ষণীয় —

১৯৫৮ সাল। ভূতের গলিতে আমাদের বাড়ির দুটি বাড়ির পূর্ব দিকে নতুন ভাড়াটে এলো পাবনাইয়া। খেলার ছলে সেই বাড়ির যে ছেলেটি আমার বন্ধু হয়ে উঠলো তিনিই শহীদুল হক (শহীদুল জহির)। আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে পড়লেও এবং তিনি আমার এক ক্লাস উপরে পড়লেও পাড়ার ছেলে হিসেবে আমরা খুবই নিকটে চলে এলাম। ... সে সময় আমরা নানাভাবে খেলাধুলা করতাম। লুকোচুরি খেলা ছিল আমাদের খুবই প্রিয় খেলা। ... বলধা গার্ডেনের পুরানো অংশ ছিল বন-বনান্ত। দিনের বেলাই গা ছমছমে ভাব!! আমরা ভাবতাম সেখানে হয়তো অজানা কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে, সেই অজানা রহস্যের সন্ধানে আমরা বনের মধ্যে অভিযান করতাম। প্রচুর কলাগাছ ছিল, ছিল বান্দর; ... নাগরমহল সিনেমা হলে আমরা হাসির সিনেমা দেখতে যেতাম। পয়সা জোগাড় করতাম বিভিন্নভাবে। বাজারের বরাদ্দ থেকে 'মেরে দিয়ে' অথবা মায়ের কাছে ঘ্যানোর প্যানোর করে। ['ভূতের গলি, শহীদুল হক এবং আমি' (রশিদ, ২০১০ : ৪৭৩-৪৭৪)]

৪. কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বয়ানে উপজীব্য হয়েছে পুরনো ঢাকার ক্রমবিকাশের ইতিহাস —

Exactly ঢাকা শহরের culture টা শুরু হয়েছে মোঘলদের সময় ঢাকা যখন রাজধানী হলো তখন থেকে। কিন্তু মোগলদের যারা সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ তারা কেউ এখানে permanently বসবাস করলেন না। যেমন বড় কাটরা যিনি বানালেন, শাহ্জা, তিনি কখনো সেখানে থাকলেন না। কিংবা শায়েস্তা খান, যিনি লালবাগের কেল্লার মূল অংশটা বানালেন তিনি কিন্তু কখনোই লালবাগের কেল্লায় থাকলেন না। তিনি থাকতেন তাঁবুতে। তাঁবুতে থাকা মানে সব সময় একটা উঁড়ু উঁড়ু ভাব। ফলে তখনকার রাজধানী শহরে বসবাসের জন্য যারা ক্রমাগত থাকল, বংশানুক্রমে বাস করল, তারা হলো মোগলদের সঙ্গে আসা নিম্নপদস্থ লোকজন, তাদের সৈন্য এরা; সেই সাথে এই নতুন পত্তন করা শহরে আশেপাশের গ্রাম থেকে আসা কিছু মানুষজন। শেষ ভাগের লোকেরা হলো কুট্টি। পুরনো ঢাকার মানুষ মাত্রেই কিন্তু কুট্টি না। আদি ঢাকার দুটো ভাগ রয়েছে। সুখভাষ এবং কুট্টি। কুট্টি যারা ঐ কুট্টিদের বংশধর আর সুখভাষ যারা মোগলদের সঙ্গে এসেছিল তাদের বংশধর বলে দাবি করে। সুখভাষরা নিজেদের কুট্টিদের চেয়ে মর্যাদাবান মনে করত। তো যেটা বলছিলাম, পুরনো ঢাকার culture গড়ে ওঠে সেই গ্রাম থেকে আসা এবং মোগল কর্মচারীদের একসঙ্গে বসবাস এবং তাদের নানাবিধ interaction-এর মধ্য দিয়ে। ঢাকাইয়া culture-টা তৈরি হয়েছে পুরোপুরি নিম্নবিত্তদের দিয়েই। এর ভেতর অভিজাত সামন্ত ব্যাপার সেরকম আছে কিনা সন্দেহ। যেটা লক্ষ্ণৌতে আছে। লক্ষ্ণৌর সাথে পুরনো ঢাকার বোধহয় অনেকটা মিল রয়েছে। তবে লক্ষ্ণৌর ব্যাপারটা different। ওটা একটা feudal শহর। কারণ ওখানে সম্ভ্রান্ত feudal-রা বসবাস করেছে। কিন্তু ঢাকার culture গড়ে তুলেছে সম্ভ্রান্ত feudal-দের সংস্পর্শে আসা নিম্নবিত্ত মানুষ মিলে। ফলে এর character ভিন্ন। Urbanisationএর কারণে একটা সপ্রতিভ ভাব এসেছে এদের মধ্যে আর স্বভাবের মধ্যে feudal-দের selfishness, cruelty আসেনি। সব মিলিয়ে culture-টার মধ্যে যা এসেছে একে আর বুর্জোয়া urbanisation বলা যাবে না, কারণ ঢাকায় তো বুর্জোয়া class গড়ে ওঠেনি। বণিকরা পুরনো ঢাকাকে dominate করেনি। ব্যবসায়ী বলতে তখন ছিল তাঁতীরা মানে হিন্দু বসাকরা। যারা মসলিন কাপড় তৈরি করত মুসলমানরা কিন্তু মসলিন বানাত না। মুসলমানরা patronize করেছে। তার পরে ইংরেজদের তৈরি কামজি নবাবরা এসে তো মাড়োয়ারীদের ঢাকায় ঢুকতেই দিল না। পুরনো ঢাকায় কোনো মাড়োয়ারীর দোকান দেখতে পাবে না। সুতরাং ঢাকায় ব্যবসায়ী cultureএর ভূমিকা ছিল না। ঢাকাইয়া culture হচ্ছে মোগলদের ছোটখাটো কর্মচারী আর ঐ কুট্টিদের দিয়েই তৈরি। [শাহাদুজ্জামানকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, (আলাউদ্দিন, ২০১১ : ৪২-৪৩)]

৫. 'ঢাকাইয়া কুট্টি' সম্বোধনে পরিচিত পুরনো ঢাকার আদি অধিবাসীদের স্বভাবগত প্রবণতা —
এরা হলো এদেশের জেনুইন urban লোক। শহরের লোক বলতে এদেশের কাউকে যদি mean করো তো তারা হলো এই ঢাকার আদি মানুষ। ওরা জানে না কবে গ্রাম থেকে এসেছে। urbanization নিয়ে ওরা কনশাস নয়। যা শহুরে বলে কখনো আলাদাভাবে ফিট করে না। শহর ব্যাপারটা ওদের স্বভাবের মধ্যে চলে এসেছে, আলাদা করে সতর্ক থাকতে হয় না। অনেক generation ধরে ওদের স্বভাবে কতগুলো ব্যাপার তৈরি হয়েছে। যেমন এদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে পরচর্চার প্রবণতা অত্যন্ত কম। এরা ঝেড়ে গল্প করবে কিন্তু প্রায় nothing personal। আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত প্রখর। [শাহাদুজ্জামানকে প্রদত্ত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার, (আলাউদ্দিন, ২০১১ : ৪২)]

৬. আলোচ্য গল্পসমূহে পুরনো ঢাকার বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের মধ্যে রয়েছে ডুমুর ও তরমুজ বিক্রেতা, বাজিকর, হোটেলের কর্মচারী, বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটে, নাটবল্টু-বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম-সেলুন ও মুদির দোকানদার, গৃহপরিচারিকা ও ভৃত্য, নাটবল্টু-কাচ-পাউরুটি-বিস্কুট-লজেন্স কারখানার শ্রমিক, কেরোসিনের বাতিওয়ালা, ঝাড়ুদারনি, মহল্লার চা-আলুপুরি ও ডালপুরির বৃদ্ধ বিহারি দোকানদার, পাড়ার মাস্তান, ডাকাত, ভিক্ষুক, থানার পুলিশ ও দারোগা, ভ্রাম্যমান চা-পান ও সিগারেট বিক্রেতা, আড়তদার, স্বল্পআয়ের চাকরিজীবী, মওলানা, ইমাম, মুয়াজ্জিন, নার্স, স্কুলশিক্ষক, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, হোটেল-সুতাকল-ডিপার্টমেন্টাল স্টোর-করাতকল ও সাততলা দালানের মালিক প্রমুখ। এছাড়া বিভিন্ন রাস্তা, গলি, এলাকা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে ভূতের গলি, বেগমবাজার, নয়াবাজার, ঠাটারিবাজার, মালিটোলা, নবাবপুর, রায়সা বাজার, টিকাটুলি, দয়াগঞ্জ, নবাবপুর, দোলাই খাল, দক্ষিণ মৈশুন্দি, ফুলবাড়িয়া, চানখারপুল, লক্ষ্মীবাজার, নারিন্দা, দয়াগঞ্জ, কলতাবাজার, রোকনপুর, কাগজিটোলা, বনগ্রাম, ওয়ারি, রহমতগঞ্জ, গেন্ডারিয়া, সদরঘাট, দোহার, পোস্তগোলা, রথখোলার মোড়, নারিন্দা রোড, টিপু সুলতান রোড, খ্রিষ্টানদের কবরস্থান সংলগ্ন ছোট সড়কদ্বীপ, জোড়পুল লেন, লালচান মকিম লেন, পদ্মনিধি লেন, শাহসাহেব লেন, ভজহরি সাহা স্ট্রীট, র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীট, দীননাথ সেন রোডের গলি, জোড়পুলের পানির ট্যাংকের গলি, মুসলিম হাইস্কুল, কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল, গ্রাজুয়েট হাইস্কুল, বাংলাবাজার স্কুল, সলিমুল্লাহ কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, সূত্রাপুর থানা, হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরি, মরণচাঁদের মিষ্টির দোকান, নিশাত-মুকুল-শাবিস্তান প্রেক্ষাগৃহ, মহল্লার মসজিদ, মন্দির, পোস্তগোলা কবরস্থান, ভিক্টোরিয়া পার্ক, বুড়িগঙ্গা নদী প্রভৃতি। উপর্যুক্ত ভৌগোলিক পরিসর ও পেশাজীবী মানুষের সমবায়ে শহীদুল জহিরের আলোচ্য গল্পসমূহে পুরনো ঢাকা পেয়েছে বিশিষ্ট অবয়ব।

৭. 'এই সময়' গল্প সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন —
এটা প্রেমের গল্পই। যদিও সময় সেখানে আছে। প্রথমে গল্পটির নাম ছিল ১৯৯২। পত্রিকায় যখন ছাপা হয়েছে অর্থাৎ ১৯৯২ সালের একটি সময়কে, আসলে বাংলাদেশের সময় সব সময়ে এক। ওই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সময় স্থবির হয়েছিল। সামাজিক অস্থিরতা ইত্যাদি। ১৯৯২ সালেও যা এই ২০০৮ সালেও তা, এই মারামারি, ধরাধরি সবই এক। ১৯৯২ যেহেতু ২০০৮ এসে একই তাই নাম পাল্টে দিলাম। [আর কে রনিকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, (রশিদ, ২০১০ : ৬২৩)]

৮. সরকার মাসুদের অভিমত —
'এই সময়' পুরোপুরি প্রেমের গল্প। একাধিক ব্যক্তি একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে। কিন্তু মেয়েটি (লেখকের ভাষায় 'রূপবতী শিরীন আকতার') ভালোবাসে তাদের একজনকে যে সবচেয়ে নিরীহ। ফলে মহল্লাভিত্তিক এই গল্পে আপনারা পাবেন চমৎকার কমেডি যদিও গল্পের শেষে শিরীনের প্রকৃত প্রেমিকটি (মোহাম্মদ সেলিম) আত্মহত্যা করে। ['স্বাতন্ত্র্যকামিতা, প্রভাবউৎকণ্ঠা ও একজন শহীদুল জহির', (রশিদ, ২০১০ : ২১৫)]
এ মন্তব্য প্রসঙ্গে আমাদের অবস্থান ইতোমধ্যেই উক্ত গল্পের বিশ্লেষণে নির্দেশিত। তথাপি বলা যায়, এটি নিছক প্রেমকেন্দ্রিক গল্প নয়। নর-নারীর আন্তঃমানবিক সম্পর্কই নিঃসন্দেহে 'এই সময়'-এর

অবলম্বন। কিন্তু লেখকের উদ্দীষ্ট তাতেই পরিসমাপ্ত নয়। তাই পনেরো পৃষ্ঠার এ গল্পে প্রথম ছয় পৃষ্ঠায় প্রেমনির্ভর আখ্যানের কোনো আভাস অনুপস্থিত। বরং পুরনো ঢাকার ভজহরি সাহা স্ট্রীটের ভূতের গলি মহল্লার প্রতিচিত্রে উপজীব্য হয় মোহাম্মদ সেলিমের করুণ জন্মবৃত্তান্ত ও তার তরুণ বয়সের শখ (বাগান করা), মহল্লার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বরূপ এবং সেই সূত্রেই তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিন সন্ত্রাসী ভাইয়ের জনমানসে ত্রাস সৃষ্টির প্রয়াস। অতঃপর গল্পাখ্যানে শিরীন আকতারের আবির্ভাবে তরুণ মোহাম্মদ সেলিম থেকে যুবক মাস্তান, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলেই সহজাত অনিন্দ্য সৌন্দর্যের আকর্ষণে তার প্রতি মোহিত হলেও শুধু এ বিবেচনায় তাদের আবেগকে প্রেম এবং সেই নারীর প্রেমিক হিসেবে বিবেচনা অর্থহীন। কেননা প্রেমনির্ভর মানবসম্পর্ক (ইন্দ্রিয়জ প্রবণতাগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী) সর্বদাই দ্বিপাক্ষিক। সেকারণেই মোহাম্মদ সেলিম ও শিরীন আকতারের স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরঙ্গতাকে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক হিসেবে মূল্যায়ন যুক্তিসংগত। অবশিষ্ট পুরুষদের শিরীনের প্রতি আসক্তি নেহাতই কামজ উন্মাদনা, অথবা যে কোনোভাবে তাকে বিয়ের মাধ্যমে যথেচ্ছ ভোগের আকাঙ্ক্ষা। দ্বিতীয়ত, এ গল্পটি মহল্লাভিত্তিক, কিন্তু কোনোভাবেই এতে হাস্যরসাত্মক ভাববস্তুর প্রাধান্য সূচিত হয়নি এবং তেমন ভাবনা সম্ভবত লেখকের শিল্পিমানসে সক্রিয়ও ছিল না। পুরনো ঢাকার অধিবাসীদের পরিহাসপ্রবণ, ব্যঙ্গাত্মক মনোভঙ্গি তাদের নিত্যদিনের পরিচর্চিত জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেকারণে এ গল্পের কিছু দৃশ্যে উক্ত প্রবণতার রূপায়ণ পরিস্ফুট। ভূতের গলির জনজীবনের পরিপূর্ণ অবয়ব সংস্থাপনের প্রয়োজনেই এটিও লেখকের পরিকল্পিত ভাবনাবিশেষ; কিন্তু সেটি অবশ্যই গল্পের কেন্দ্রীভূত ভাববস্তু নয়। তাই 'কমেডি' হিসেবে এ গল্পকে আখ্যাদান আমাদের বিবেচনায় অযৌক্তিক, কষ্টারোপিত। গল্পটির প্রারম্ভ থেকে পরিণতিস্রোতে মোহাম্মদ সেলিমের পারিবারিক বিপর্যয়, তার হৃদয়কুঞ্জে শিরীনকেন্দ্রিক প্রেমকলির আকস্মিক স্ফুরণ ও পরিসমাপ্তি অংশে সম্ভাবনাময় জীবনের অকাল পরিণতিগত বাধ্যবাধকতাই এ গল্পের মুখ্য আধার। সর্বোপরি, তার আত্মহত্যার প্রসঙ্গ পুরোপুরিই অবান্তর। কীভাবে এবং কেন মহল্লার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের দ্বারা সে নিহত হয়, তার রূপরেখা গল্পে অনুচ্চারিত, অথচ দিনের আলোর মতোই জাজ্বল্যমান। সমাজদেহের দুষ্ট ব্যাধিরূপ প্রভাবশালীদের অবাধ ক্ষমতাচর্চা ও আত্মস্বার্থোদ্ধারের অভিলাষ, প্রশাসনব্যবস্থার দুর্নীতিগ্রস্ততা, অর্থ ও পেশীশক্তির যথেচ্ছ ব্যবহারপূর্বক সন্ত্রাসীদের উত্থান ও জনমনে তাণ্ডবলীলার মাধ্যমে তাদের পরাভব স্বীকারে বাধ্য করার পরিণতি হলো মহল্লাবাসীর সমষ্টিচেতনায় বিস্তৃত অস্তিত্বসংকট ও আত্মসর্বস্বতা, প্রবল বিচ্ছিন্নতাবোধ। এভাবেই সামাজিক বিকৃতি ও মূল্যবোধগত অবক্ষয়, রাষ্ট্রিক অন্তঃসারশূন্যতাজাত সংকটের সহায়ক অনুষঙ্গ হিসেবে এ গল্পে প্রেমের প্রসঙ্গ সংযুক্ত হয়েছে।

৯. সমালোচকের অভিমত —

ফুলের বাগানের প্রতীকী ব্যবহার একদিকে প্রেমের চিরন্তন নিষ্কলুষতা, কিশোর সেলিমের স্বপ্নময় জগতের হাতছানি, তার চারিত্রিক নির্মলতাকে বাঙ্ময় করেছে; অন্যদিকে ফুলের বাগান ধ্বংস করার মাধ্যমে একশ্রেণির মানুষের হিংস্র কামনা-বাসনা, প্রেমের মোড়কে লালসার সর্বগ্রাসী অপতৎপরতাকে চিত্রিত করেছে। পেশিশক্তির কাছে প্রকৃতির নির্মলতা আর প্রকৃতির মতোই সহজ-সরল, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক কিশোর মোহাম্মদ সেলিম আর যুবতি শিরীন আকতারের অসম বয়সের হৃদয়াকর্ষণকে চরম মূল্য দিতে হয়। যদিও শিরীন আকতারের পরিণতি গল্পে উহ্য, কিন্তু মাস্তান আবুর সঙ্গে তার জোরপূর্বক বিয়ের পরিণতি কী হতে পারে তা ধারণা করা যায়। মহল্লা-বাসীর নীরব অপ্রতিবাদী ভূমিকা মূলত পেশিশক্তির কাছে পরাভূত গোষ্ঠীচেতনাকে প্রতিফলিত করেছে। [মিহির মুসাকী, 'ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প : শিল্পের চতুর্মাত্রিকতা', (রশিদ, ২০১১ : ৪৩৮)]

১০. লেখকের অভিমত —

কাঁটাকে গভীরভাবে দেখা দরকার। কাঁটা হচ্ছে যে, খুব সহজ অর্থে আমরা যে, তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা মনে করি 'কাঁটা' সে রকম গল্প না। কারণ এখানে সব ধর্মের লোকের প্রতি মহল্লার

লোকদের যে সহানুভূতি তা উল্লেখ আছে এবং তাদের অসহায়ত্বের কথা তো আছেই। দুই নম্বর, এই সব বিষয়ে তাদের যে অপরাধবোধ এইসব আছে। কিন্তু আমার যেটা মনে হয় — সাম্প্রদায়িকতা অনেক গভীর জিনিস। তা বুঝা দরকার। বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে দেখতে হবে মূল ফোকাসে।

সাম্প্রদায়িকতা কিন্তু সম্প্রদায়েরই সমস্যা। সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু সবারই সমস্যা সাম্প্রদায়িকতা এবং এটা খুব গভীরে থাকে। যারা অসাম্প্রদায়িক বলে — এটা যখন বাংলাদেশ ছিল না, যারা অনেক নমস্য ব্যক্তি, সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে খুবই নমস্য মানে অসাম্প্রদায়িক তাদের গভীরে যদি আপনি ঢুকেন ... তাহলেও আপনি দেখবেন সাম্প্রদায়িকতা খুব গভীর একটা সমস্যা, ফলে এখানে *'কাঁটা'* হচ্ছে ওই অর্থে। এ গল্পের নামটা আমি দুইবার পরিবর্তন করেছি। প্রথম লিখেছি *'কাঁটা'* পরে আবার লিখেছি *'মনোজগতের কাঁটা'*। আমার মনে হয়েছিল এটা একটু দেখানো দরকার এটা কীভাবে মনোজগতে থাকে। ... এটি রক্তের ভিতরে থাকে। পরে নাম আমি আবার চেঞ্জ করেছিলাম কিন্তু লোকের আপত্তিতে। আমার মনে হয়েছে যে, একদম বলে দেয়ার দরকার নেই যে, এটা মনোজগতের কাঁটা। কাঁটা বিভিন্নভাবে আছে পাঠক ঠিক করে নিবে। কিন্তু আমার ভয় হয়– পাঠক অনেক সময় ঠিক করতে পারে না। এজন্য *'মনোজগতের কাঁটা'* লিখেই দিয়েছিলাম। [আর কে রনিকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, (রশিদ ২০১১ : ৬২৪)]

১১. সরকার আবদুল মান্নান এ গল্পের শেষাংশে মহল্লাবাসীর সমষ্টিগত অবচেতনায় সতত ক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির আত্মবিনাশী রূপের বাস্তবায়নে সময়ের উল্লম্ফনধর্মিতা ও পারম্পর্যহীন ঘটনাপ্রবাহের সমন্বিত ভূমিকা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন —

যৌক্তিক সময়ের একটি বিন্যাস আপাত লক্ষ্য করা গেলেও গল্পশেষে সময়ের প্রেক্ষিতে বস্তুর পরিবর্তনগত মাত্রাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। ... সুতরাং 'subjective facts'- এর বিধানগুলো অর্থাৎ 'এখন', 'এখানে', 'আমি' ইত্যাকার প্রথাবদ্ধ ধারণাগুলো তিরোহিত হয়ে 'spatial' of personal subjective facts প্রধান হয়ে ওঠে। ... সময়ের একটি জটিল সমগ্র বিচিত্র মাত্রা নিয়ে গল্পটির মধ্যে ধরা দিয়েছে (?)। কিন্তু সেই মাত্রা ব্যঞ্জনার ও বাচনের যে বহুত্ব নিয়ে উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারত, গল্পটির শেষ পৃষ্ঠায় এসে সেই ব্যঞ্জনা ও বাচনের বহুত্ব ঘুচে যায়। কেননা গল্পকার এই শেষ পৃষ্ঠায় এসে সময়ের জটিল গ্রন্থি বর্ণনা করতে গিয়ে প্রকারান্তরে গ্রন্থিমোচনের প্রয়াস পান, পাঠকের ভাবনার অনেক দায় তিনি নিজেই গ্রহণ করেন। ['শহীদুল জহির : এক অসমাপ্ত কথাশিল্পের স্থপতি', (রশিদ, ২০১১ : ১৫৯)]

উপর্যুক্ত বক্তব্যের সঙ্গে আমরা স্বভাবতই ভিন্নমত পোষণে সচেষ্ট, যা ইতপূর্বেই উক্ত গল্পের নির্ধারিত পরিসরে বিশ্লেষিত। বাস্তব পটভূমির প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার যে অভিজ্ঞতা, তা-ই মূলত মানব মস্তিষ্ককোষে সময়ের প্রবহমানতার ধারণাকে স্পষ্ট করে। অর্থাৎ কোন ঘটনা অতীতে সংঘটিত হয়েছে, কোনটি এখনো ঘটে চলেছে অথবা কোনটি ভবিষ্যতে ঘটবে, তা অনুধাবনের সামর্থ্য অর্জনে মানুষ সক্ষম হয় তার কর্ম সম্পাদন-প্রক্রিয়ায়। তার যে কোনো কাজের পশ্চাৎপটেই সময়ের নৈর্ব্যক্তিক উপস্থিতি অনিবার্য। এ গল্পে ভূতের গলির মহল্লাবাসীর জীবনে সুতীব্র অভিঘাত সঞ্চারকারী তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সবিশেষ তাৎপর্যবহ, যেগুলো মূলত সাম্প্রদায়িক মানসিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। (১৯৬৪ সালের দাঙ্গা, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভীষিকাময় পর্যায়ে সুবোধচন্দ্রকে জনৈক মুসলিম মহল্লাবাসীর পাতকুয়ায় ঠেলে মৃত্যুপথে অগ্রসর করার পরিণতিতে তার স্ত্রী স্বপ্নার উক্ত কুয়ায় আত্মহত্যা ও নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আনন্দে উল্লসিত সুবোধ-স্বপ্না দম্পতির সংগোপনে মিষ্টি খাওয়ার গুজবের প্রতিক্রিয়ায় মহল্লার মুসলিম অধিবাসীদের দ্বারা সহিংসতার সম্মুখীন হয়ে প্রাণপাত।) লক্ষণীয়, উপর্যুক্ত ঘটনাসমূহের সঙ্গে সমগ্র মহল্লাবাসীর সম্পর্ক কখনো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, আবার কখনো অনিচ্ছাকৃত। তাই এক্ষেত্রে অন্যের কৃতকর্মের দায়ে আত্মসংশ্লিষ্টতাগত কারণেই (মূলত সাম্প্রদায়িক বিভাজনগত খণ্ডিত মানসিকতার কারণেই ব্যাপারটি ঘটে। তবে ধর্মীয় সহনশীলতার বিরল গুণটিও মহল্লাবাসীর মধ্যে যে উপস্থিত,

তার নিদর্শনও গল্পে রয়েছে।) নিজেকে অভিযুক্ত করার পরিণতিতে সৃষ্ট আত্মগ্লানি তার মনোভূমিতে উদ্ভূত হতে বাধ্য। স্বাভাবিকভাবেই দুই দশকের অধিককাল জুড়ে তাদের চেতনালোকে সর্বগ্রাসী সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষ মহীরুহে ক্রমস্ফীতির সুযোগ পায়, তার অভিঘাতেই সুবোধ-স্বপ্না দম্পতিকে নির্মমভাবে হত্যার নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হয়। এ গল্পের শেষাংশে লেখক তাদের চিত্তলৌকিক বিভ্রান্তি ও সংশয়, প্রাত্যহিকতার পারম্পর্যরক্ষায় বিঘ্ন ও শৃঙ্খলাহীন অযৌক্তিকতার কার্য-কারণ স্পষ্টই নির্দেশ করেছেন। যেহেতু তারা প্রবল অপরাধবোধ ও আত্মপীড়নের শিকার, তাই তাদের চেতনালোকের বিবেচনাপূর্ণ, যুক্তিনিষ্ঠ রূপটি ইতোমধ্যেই বিপর্যস্ত। কারণ তারা সংঘটিত কৃতকর্মের অনুশোচনা ও অপরাধবোধের গ্লানিতে আক্রান্ত। আর, এ পর্যায়ে যেহেতু ব্যক্তির চেতনালোকের বিভিন্ন স্তর সমীকৃত হয়ে যায়, তাই সময়ের পারম্পর্য অনুসরণের সহজাত বোধটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট ভেদাভেদ আয়ত্ত করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সেকারণেই তার মনোভঙ্গিতে তখন অতীত থেকে ভবিষ্যৎ, বর্তমান থেকে অতীত বা ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের অবাধ অনুপ্রবেশ সংঘটিত হয়। বাস্তব পটভূমিতে হয়তো সেই মুহূর্তে সে কোনো কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হতে পারে, কিন্তু তার মনোগহীনে তখনো অবিরাম চলতে থাকে উল্লম্ফনধর্মী সংবেদনারাশির অনুরণন (যা তার জীবনাভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট)। সেকারণেই লেখক জানান — এরপর কোনো এক সময় ভূতের গলির লোকেরা সময়ের এক জটিল গোলক ধাঁধার ভেতর প্রবেশ করে, কারণ দেখা যায় যে, তারা স্বপ্নার বানানো নিমকপারা খাওয়ার কথা ভুলে যেতে পারে না এবং তাদের এই কথাটি সর্বদা মনে পড়ে যে, সুবোধচন্দ্রকে তারা ক্রমাগতভাবে বলেছিল, ডরায়েন না, কিন্তু সুবোধচন্দ্র এবং তার স্ত্রী ক্রমাগতভাব মহল্লার লোকদের পুনরায় বিষণ্ন লাগে এবং গ্লানিবোধ হয় এবং তখন কোনো একদিন মহল্লার একদল লোক কোদাল হাতে আব্দুল আজিজ ব্যাপারির বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় এবং তাদের জীবনের সবচাইতে বড় বিভ্রান্তির ভেতর প্রবেশ করে এবং তাদের মনে হয় যে, তাদের জীবনের সময়ের কাঠামোটি ভেঙে পড়েছে। ... তারা বুঝতে পারে যে তখনও পর্যন্ত মহল্লায় হয়তো সুবোধচন্দ্র আসে নাই, দেশ স্বাধীন হয় নাই এবং অযোধ্যার মসজিদও ভাঙা হয় নাই; কিন্তু তখন, একই সঙ্গে তারা সুবোধচন্দ্রের ক্রমাগতভাবে কুয়োর ভেতর পড়ে যাওয়ার ঘটনার কথা মনে করতে পারে এবং তারা খুবই বিচলিত এবং গ্লানি বোধ করে এবং তারা বিভ্রান্ত হয়। তারা সময়ের কোন তলে আছে তা তারা বুঝতে পারে না, কিন্তু যে নিমকপারা তারা খেয়েছিল অথবা খাবে তার স্বাদের কথা তারা ভুলতে পারে না এবং ভয় না পাওয়ার যে কথা তারা সুবোধচন্দ্রকে বলেছিল অথবা বলবে, তার ব্যর্থতার স্মৃতি তাদেরকে এমনভাবে পীড়ন করে যে, তারা আব্দুল আজিজ ব্যাপারিকে বলে, আপনের এই কুয়া আমরা বুজায়া ফালামু, এবং তার বাধা উপেক্ষা করে তার চোখের সামনে মাটি কেটে কুয়ো বুজিয়ে ফেলে, তারপর সন্ধ্যা হলে তাদের কেউ কেউ রথখোলার মোড় থেকে ইপিআরটিসির দুই দরজাওয়ালা লম্বা সবুজ রঙের বাসে চড়ে সদরঘাট যায়। ... এই লোকেরা বাস সদরঘাট পৌছার আগেই বিচলিত হয়ে পড়ে, কারণ, তাদের স্বপ্না এবং সুবোধচন্দ্রের কথা মনে পড়ে, তাদের মনে হয় যে, কুয়ো বুজিয়ে ফেললে সুবোধচন্দ্রের কুয়োয় পড়ার কথা নয়, (জহির, ২০০৬ : ১২৬-১২৭)

১২. 'কোথায় পাব তারে' গল্পে নায়কের প্রেমভাবনার স্বরূপ নির্দেশ প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত —
এটা তো খুব ফানি আর অ্যাবসার্ড গল্প। আমি এটা করেছি যেন, পাঠকের মনে হয় — এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। তবে বাস্তব জীবনে এরকম বর্ণনা দেয় অনেকে। ... (এরকম পথ ধরে শেফালির বাড়ি পৌছানো যেমন অসম্ভব, তেমনি আব্দুল করিমের জীবনে প্রেমও একটি অসম্ভব বিষয়) ... এমনকি শেফালিও চায়নি যে, আব্দুল করিম সেখানে পৌছাক এবং একপর্যায়ে সে সেটা বুঝতেও পারে। তার উদ্যোগ ছিল, অনেকদূর পর্যন্ত গিয়েছিলোও সে, কিন্তু যখন বুঝতে পারে যে, এটা একটা অসম্ভব কাজ, গন্তব্যটাই অসম্ভব, তখন ফিরে আসে। [আহমাদ মোস্তফা কামালকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, (রশিদ, ২০১০ : ৫৯৮)]

১৩. এ প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত —

আমার ধারণা মানুষ যখন অন্যকে প্রেম করতে দেখে তখন সে খুব ঈর্ষান্বিত হয়। নিজের জীবনে একটা অর্থহীনতার বোধ জাগে। কারণ আমরা সবাই প্রেম পাইতে চাই, যেহেতু পাই না, তাই যখন দেখি অন্য কেউ প্রেম করছে তখন একধরনের ইয়ে (?) লাগে। আমরা স্বীকার করতে চাই না বটে যে, আমরা প্রেম পাই নাই, কিন্তু একধরনের মন খারাপ হয়। এটা ভুল হতে পারে, কেউ হয়তো বলতে পারে আপনার কথা ভুল, আমাদের কষ্ট হয় না — সেটাও হতে পারে। কিন্তু আমার ধারণা এটা হয়, হয়তো আমারও এটা হয়, আমারও হয়তো মন খারাপ হয়, মনে হয় ও প্রেম করছে, আমি পারি নাই। এই ব্যাপারটাকে আমি জেনারালাইজ করতে চেয়েছি। [আহমাদ মোস্তফা কামালকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, (রশিদ, ২০১০ : ৫৯২)]

১৪. সমালোচকের অভিমত —

'কোথায় পাব তারে' গল্পে প্রায় পুরোটা জুড়ে 'ময়মনসিং' বা 'শেফালির' কাছে যাবার জন্য আব্দুল করিমের যে তীব্র আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে, তা আসলে প্রেমের কাছে যাবার জন্য তার আকুলতা। এই প্রেমই তার বেকার ও গঞ্জনামুখর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। সেই ইঙ্গিতও আছে গল্পে — 'এটা আব্দুল করিমের একটা খেলাই, এবং সে হয়তো নিজের সঙ্গেই খেলে, শেফালি এবং ময়মনসিং বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে সে হয়তো তার জীবনের কর্মহীনতার ভিতর এই এক অবলম্বন গড়ে তোলে।' শুধু তাই নয়, তার এই প্রেম মহল্লাবাসীর মধ্যেও ঈর্ষার জন্ম দেয় ... এ হচ্ছে প্রেমহীন মানুষের বেদনা ও হাহাকারের গল্প। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায় — আব্দুল করিম এতদূর পর্যন্ত গিয়েও ফিরে আসে কেন? কারণ, আমার মনে হয়, সে একসময় বুঝে যায় — আসলে ওখানে পৌঁছানো যাবে না। প্রেম তার জন্য নয়। সে হয়তো কোনো এক অনির্ণেয় কারণে সেটা পেতেও চায় না। প্রেম পাওয়া নয়, প্রেমের সন্ধান করাটাই তার কাছে জীবন। শুধু তার কাছেই নয়, হয়তো সবার কাছেই। আমরা সবাই হয়তো একটি প্রেমের সন্ধান করতে করতেই জীবন কাটিয়ে দিই। কেউ হয়তো পায়, কেউ কখনোই পায় না। আব্দুল করিম না পাওয়ার দলে। [আহমাদ মোস্তফা কামাল, 'শহীদুল জহিরের রহস্য সন্ধান', (রশিদ, ২০১০ : ১৭৬)]

১৫. 'মহল্লায় বান্দর, আব্দুল হালিমের মা এবং আমরা' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের আত্মজৈবনিকতার অভিঘাত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁরই জবানিতে —

জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের নিজস্ব একটা গতিশক্তি থাকে, দাবানলের মত, একবার শুরু হইলে এ নিজে নিজেই ছড়ায়, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তাই ঘটেছিল। আমার প্রাথমিক পারিবারিক বিষয়গুলো গুছায়া নেয়ার পর, আমি ঢাকায় এসে একা বাস করছিলাম এবং পথ খুঁজছিলাম যুদ্ধে যাওয়ার। ... মহল্লায় বান্দর ... গল্পের আব্দলু হালিম কিন্তু আমার পরিচিত, ওর নাম আসলে কাঞ্চন, যুদ্ধ জয়ের পর ফেরার পথে বুড়িগঙ্গায় নৌকায় ডুবে খামাখা মরে যেতে পারলো, আমি পারলাম না! ... যুদ্ধের শুরুর দিকে ঢাকায় নয়াটোলাতে আমাদের বাসায় ছিলাম। ... দুই একদিন পরে, একটা পর্যায়ে আমরা বুঝলাম এখানে থাকা যাবে না, পরে জিঞ্জিরার দিকে চলে গেলাম। ... জিঞ্জিরার ম্যাসাকারের কথা আমি ভুলতে পারি না। আমার লেখায় বারবার জিঞ্জিরার কথা আসে। [কথাশিল্পী কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, (রশিদ, ২০১০ : ৫৬১)]

১৬. এ গল্পে রয়েছে আত্মজৈবনিকতার বিশ্বস্ত উপাদান। বাল্যকালের ঘটনাকে তিনি অবলীলায় আব্দুর রহমানের প্রেমহীন জীবনে বিস্তৃত আত্মহাহাকারের বীজরূপে সমীকৃত করেছেন —

আমাদের বাসার নম্বরও ছিল ৩৬ ভজহরি সাহা স্ট্রীট, যাকে লোকে ভূতের গলি নামেও জানত। ৩৬ ভূতের গলির আমরা যে বাসায় থাকতাম সেখানে একই সীমানা দেয়ালের মধ্যে ৩টি বাসা ছিল। পাশাপাশি, সবগুলই একতলা, চুন-সুরকি আর লোহার কড়ি-বরগার। ... বিরাট বাসা, সামনে রোয়াকসহ দোতলা দালান। আমাদের বাসার পাশেই গলির মোড়ে ছিল ইলেকট্রিক পোস্ট। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাতিঅলা আসত ঘাড়ে মই আর হাতে কেরোসিনের পট নিয়ে, কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে দিয়ে যেত। [হাবিবুল হক, 'অনুজের কথা', (রশিদ, ২০১০ : ৫২৫)]

১৭. 'প্রথম বয়ান' গল্পের আব্দুর রহমান 'কেরোসিন বাত্তির জায়গা খোঁজার ছলে' কী যেন খোঁজে! — এর প্রত্যুত্তরে লেখকের অভিমত—

আসলে হয়তো সে প্রেমটাই খোঁজে। 'বাত্তি' বলার কারণে লোকে অনেককিছুই মনে করবে হয়তো — আলো খোঁজে ... বাত্তি বললেই একটা রূপক এসে যায় আর কী, কিন্তু সে অন্তত আলো-টালোর মতো মহৎ কিছু খোঁজে না! ব্যাপারটা অত বড় কিছু না-ও হতে পারে। সে আসলে ওই বাত্তির ধান্ধার কারণে প্রেমের সুযোগ হারিয়েছে। [আহমাদ মোস্তফা কামালকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, (রশিদ, ২০১০ : ৫৯৮-৫৯৯)]

১৮. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জানিয়েছেন —

এটাও urbanization-এর effect। ভাষার যে forceful ব্যাপার, এটা এসেছে দীর্ঘদিনের শহুরে জীবনযাত্রা, এর গতি, এর struggle-এর কারণেই। শাহাদুজ্জামানকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, (আলাউদ্দিন, ২০১১ : ৪৩)

১৯. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অভিমত —

তারা কথাবার্তায় অবিরাম এইসব স্ল্যাং ব্যবহার করেন, এগুলো তাদের কাছে প্রকাশের অপরিহার্য মাধ্যম। এসব কিন্তু শুধু গালাগালি নয়, রাগ, বিরক্তি, ক্ষোভ, গ্লানি এমনকি ভালোবাসা ও স্নেহ প্রকাশের উপায়। ... ঢাকার আদিবাসীদের স্পর্শকাতরতা কয়েক প্রজন্মের নগরবাসের ফলে সরাসরি প্রকাশে বাধা পায়। নিজের কথা সরাসরি প্রকাশ এদের কাছে স্যাঁৎসেতে আদিখ্যেতা বলে বিবেচিত হয়। নিজের তীক্ষ্ণ অনুভূতিটিও জাগাতে হলে দুটো স্ল্যাং বলে আবেগের তরলতাটি ঘুচিয়ে নেন এরা। (আলাউদ্দিন, ২০০৯ : ৪৭৪)

গ্রন্থপঞ্জি

আলাউদ্দিন মণ্ডল, ২০০৯। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নির্মাণে বিনির্মাণে*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আলাউদ্দিন মণ্ডল (সম্পাদিত), ২০১১। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস চূর্ণভাবনা ও চূর্ণকথা সংগ্রহ*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত), ২০১০। *শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

শহীদুল জহির, ২০০৬। *নির্বাচিত গল্প*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

শহীদুল জহির, ২০০৮। *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।